দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

মোদী-বিরোধী অভিযানের তির ব্যুমেরাং হয়ে ফিরছে মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই
— পৃঃ ১০

ভারতের অখণ্ডতার জন্যই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি প্রয়োজন
— পৃঃ ১৫

৭১ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ১ এপ্রিল ২০১৯।। ১৭ চৈত্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১৭ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১ এপ্রিল - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কংগ্রেসের দেশদ্রোহী চরিত্র বেআব্রু করেছেন রাহুল ▯ বিশ্বমিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদিগিরিতে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

নরেন্দ্র মোদী ভারতের নবোত্থানেরই মুখ ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৮

মোদী-বিরোধী অভিযানের তির বুমেরাং হয়ে ফিরেছে মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই ▯ শৌভিক রায় ▯ ১৮

পাঁচ বছরে অসাধ্য সাধন করেছেন মোদী ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৩

ভারতের অখণ্ডতার জন্যই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি প্রয়োজন ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ১৫

কেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থীদের ভোট দেবেন না ▯ সৃজিত রায় ▯ ১৭

কাশ্মীরের মুসলমানরা কি সত্যিই ভারতীয়? ▯ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ▯ ২০

সারা রাজ্যে বিজেপিকে নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে ▯ ২৩

মমতার কাছে এবারের নির্বাচন ষোলোর থেকে কঠিন ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৪

তৃণমূলের আকাশ থেকে তারা খসছে, খসবে আগামী দিনেও ▯ সনাতন রায় ▯ ২৬

ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার আজও সমান প্রাসঙ্গিক ▯ অম্লান কুসুম ঘোষ ▯ ৩১

মমতা ব্যানার্জির প্রতিটি পদক্ষেপ স্বৈরাচারের পদধ্বনি ▯ সুজাত রায় ▯ ৩৫

বাঙ্গালি হিন্দুর 'নিজস্ব মাতৃভাষা দিবস' কেন প্রয়োজন ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জী ▯ ৩৭

২০১৯ লোকসভা নির্বাচন এবং মমতার দ্বিচারিতা ▯ ডা: আর দাস ▯ ৪২

বাঙ্গালি কি এখনো ইতিহাস তৈরি করতে সক্ষম? ▯ সুজয় চট্টোপাধ্যায় ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯

সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯

চিত্রকথা : ৪০ ▯ রঙ্গম : ৪১▯ অন্যরকম : ৪২ ▯

উবাচ : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
৮ এপ্রিল
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ এপ্রিল
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এবারও কি মোদী ঝড়?

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে প্রাক্ নির্বাচনী সমীক্ষার বহর। কেউ বলছেন এবার এন ডি এ-র আসনসংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যাবে। আবার কেউ বলছেন ২৮৪ কিংবা ২৬৪। কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দল নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভ করার নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে অনেকটাই। প্রশ্ন হলো, সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন? তাঁরা কি আরও একবার নরেন্দ্র মোদীর নামে ঝড় তোলার অপেক্ষায় রয়েছেন? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আলোচিত হবে এইসব বিষয়। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তৃণমূল আর কতদিন?

একটি প্রশ্ন এখন ঘুরিয়া ফিরিয়া সব মহলেই আলোচিত হইতেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস দলটির অস্তিত্ব আর কতদিন? রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই এই দলটি সম্পর্কে যে এমন একটি প্রশ্ন উঠিতেছে— তার ন্যায্য কিছু কারণও রহিয়াছে। সম্ভবত এই প্রশ্নটি অনেকের হৃদয়েই গুঞ্জরিত হইতেছিল, কিন্তু নির্বাচনী যুদ্ধ শুরু হইবামাত্রই প্রশ্নটি এখন প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছে। এইরকম একটি প্রশ্ন উঠা মানে বুঝাই যায়, তৃণমূল কংগ্রেস দলটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ ক্রমশই সন্দিগ্ধ হইতেছে এবং তাহারই পাশাপাশি এই দলটি সম্পর্কে মানুষ বীতশ্রদ্ধও হইয়াছে। এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দলটির উত্থান হইয়াছিল মূলত সিপিএম বিরোধিতা করিয়া। ভালো করিয়া ভাবিলে বুঝা যাইবে, একমাত্র সিপিএম বিরোধিতা ব্যতীত তাহার আর অন্য কোনওরূপ কর্মসূচি ছিল না। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রতি মানুষের নেগেটিভ ভোটিং-ই তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনিয়াছিল। ক্ষমতায় আসিবার পর আট বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও কোনওরকম গঠনমূলক কর্মসূচি এই দলটি রাজ্যের মানুষকে দিতে পারে নাই। বরং এখন উগ্র বিজেপি বিরোধিতার রাজনীতিতে মনোনিবেশ করিয়াছে তাহারা। দলের নেতা-নেত্রীরা বুঝিতে পরিতেছেন না, রাজনীতিতে সর্বদা নঞর্থক মানসিকতা মানুষ ভালো ভাবে গ্রহণ করে না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিও এই রাজ্যের মানুষ আর গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না।

এই কথা বলিলে কিছু ভুল হইবে না যে, গত আট বৎসরে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের মানুষের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিয়াছে। সিপিএমের অপশাসনের অবসানে যে দুরাচারগুলি দূর হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল মানুষ, তাহা দূর হওয়া তো দূরের কথা, বরং তৃণমূলের শাসনকালে তাহা আরও প্রকট, আরও সর্বত্রগামী হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, সিপিএম আর তৃণমূল আসলে একই মুদ্রার এই পিঠ-ওই পিঠ। সিপিএম এবং তৎপরবর্তীকালে তৃণমূলের এই বিয়াল্লিশ বৎসরের অপশাসন হইতে রাজ্যের মানুষ এখন মুক্তি চাহিতেছে। তাই তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব এই দলটির বিদায়ের বার্তা শুনিতে চাহিতেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটির অভ্যন্তরে কোনওরূপ গণতন্ত্র নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরাচারী মানসিকতার ফসল এই দলটি। এই দলটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথাই শেষ কথা। তাহাদের কথাই দলটির আইন। একজন স্বৈরাচারী মানসিকতার নেত্রীর অধীনে এই দলটিতে অনেকেই এখন আর থাকিতে চাহিতেছেন না। তৃণমূল কংগ্রেসে যে সকল আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন নেতা-কর্মী রহিয়াছেন, তাঁহারা এখন এই দলের সঙ্গে সমস্তরকম সংশ্রব ত্যাগ করিতে উৎসুক। ইতিমধ্যেই অনেকে সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও অনেকে করিবেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে। এইরকম চলিতে থাকিলে আগামীদিনে এই দলটিতে বাতি জ্বালাইবার জন্য শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত আর কেহ থাকিবেন বলিয়া মনে হয় না।

তাঁহার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে খুব একটা আলোকোজ্জ্বল নহে, তাহা বোধকরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝিতে পারিতেছেন। যে কারণেই অসংলগ্ন আচরণের মাধ্যমে তিনি নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিতে নামিয়াছেন। মজার কথা, তাঁহার নিম্নমুখী জনপ্রিয়তার গ্রাফ এই কুৎসা প্রচারের ফলে আরও দ্রুত নিম্নমুখী হইতেছে। আশঙ্কা হয়, লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপির প্রাপ্ত আসন যদি দশের ঘরে পড়ে, তাহা হইলে তৃণমূল কংগ্রেস নামক দলটি নিছক সাইনবোর্ডে পরিণত হইবে না তো?

সুভাষিতম্

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম নানৃতাৎ পাতকং পরম্।

অতঃ সর্বেষু কার্যেষু সত্যমেব বিশিষ্যতে।। (মহাভারত)

সত্যের চেয়ে বড়ো ধর্ম নাই। মিথ্যার চেয়ে বড়ো পাপ নাই। সেজন্য সমস্ত কাজেই সত্যাচরণ আবশ্যক।

কংগ্রেসের দেশদ্রোহী চরিত্র বেআব্রু করেছেন রাহুল

বিশ্বামিত্রের কলম

নেহরু থেকে ইন্দিরা হয়ে রাজীব— স্বাধীনতার পর কংগ্রেসি রাজত্ব দেশকে অনেকভাবে বিপদগ্রস্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু এরা কেউই কংগ্রেসকে 'দেশদ্রোহী' করে তোলেননি। রাহুল যা হেসেখেলে করতে পেরেছেন।

অবশেষে রাজ্যবাসীর সামনে এটুকু স্পষ্ট হয়ে গেল যে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আর যাই হোক বাম-কংগ্রেস জোট বা আসন রফা, যা খুশি বলা হোক না কেন, তা আর হচ্ছে না। বামেদের জন্য কংগ্রেস দু'একটি ছাড়বে, বামেরাও কংগ্রেসের জন্য দু-একটি ছেড়েছে— বাদবাকি আসনে বন্ধুত্বের সুর কেটে লড়াইটাই হবে। রাজনীতি-সচেতন মানুষ



এবারে যতটা না বিস্মিত হয়েছেন, তার থেকে ঢের বেশি অবাক হয়েছিলেন ২০১৬-তে বিধানসভা নির্বাচনের সময়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাম-কংগ্রেস, আরও স্পষ্ট করে বললে সিপিএম-কংগ্রেস দ্বৈরথ দেখে এসেছেন। মমতা কংগ্রেস ছেড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়েই এ রাজ্যে বামপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন তিনি।

রাজনীতি অসম্ভাবনার শিল্প ঠিকই, কিন্তু অহি-নকুলেও যে দোস্তি জমতে পারে তা ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগেও কেউ বিশ্বাস করতো না। শোনা যায়, এক বাংলাখ্যাত বাজারি পত্রিকার বড়ে সরকার নাকি ওই সাপ-বেজি জোটের মুখ্য কারিগর ছিলেন, যার মাশুল তাঁকে চোকাতে হয়েছিল নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গদি-চ্যুত হয়ে। সে যাই হোক, বাম-কংগ্রেস জোটের ফলাফলে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার। বামপন্থীরা যাও বা কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারেন, কংগ্রেসিরা বামপন্থীদের নৈব নৈব চ। কারণটা একবারে সোজা। ৭১-এ সাঁইবাড়ির রক্তমাখা ভাত, আর ৭৭-পরবর্তী চৌত্রিশটা বছর ভুলে যাওয়া আর যারই হোক, আপাদমস্তক কংগ্রেস-কর্মীর পক্ষে সহজ নয়।

এদিকে এটাও মাথায় রাখা দরকার যে বামেরা তো কংগ্রেসিদের শ্রেণীশত্রু ভাবে। তাহলে অন্তত ভোটের ফলে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বামেদের ভোট কংগ্রেস পায় কী করে? এর মূলে নিশ্চয়ই রাহুল গান্ধীর তৎকালীন কার্যকলাপ। যে কংগ্রেস সরকার আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ রাতারাতি কার্যকর করেছিল তার পরিবারবর্গকে জানবার সময়টুকুও না দিয়ে, সেই কংগ্রেসের প্রধান মুখটিই যখন অকৃত্রিম ভোটলোলুপতায় চরম-নরম সবধরনের বামপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আফজলের মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপকদের পাশে দাঁড়ান, তখন আর কংগ্রেসকে শ্রেণীশত্রু ভাবার অবকাশ খাঁটি কমিউনিস্টদের অবশ্যই থাকে না। গত বিধানসভা ভোটে যার প্রতিফলন বিলক্ষণ দেখা গেছে এবং বামেদের ভোটে বলীয়ান কংগ্রেস আসন সংখ্যার বিচারে বিরোধী দলের মর্যাদাটুকু নিশ্চিন্তে হাসিল করেছে।

তারপর কংগ্রেসের হাঁড়ির হাল যা হবার তাই হয়েছে। মমতার দলের প্রলোভন ছিলই, কিন্তু বিনা প্রলোভনেও অনেক খাঁটি কংগ্রেসকর্মী দল ছেড়েছেন, সারাদেশ জুড়েই। ফলে গোটা দেশেই রাহুলের কংগ্রেস আর বামপন্থীদের আজ বেআব্রু দশা। উত্তরপ্রদেশে মায়া-অখিলেশই হোক বা এ রাজ্যে বামফ্রন্ট— এরা কেউই আর দু-দশটার বেশি আসন কংগ্রেসকে ছাড়ে না। অথচ এই ভোটবল নিয়ে স্রেফ ঘোলা জলে মাছ ধরে রাহুল নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করে হাসির খোরাক হয়েছেন। নেহরু থেকে ইন্দিরা হয়ে রাজীব— স্বাধীনতার পর কংগ্রেসি রাজত্ব দেশকে অনেকভাবে বিপদগ্রস্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু এরা কেউই কংগ্রেসকে 'দেশদ্রোহী' করে তোলেননি। রাহুল যা হেসেখেলে করতে পেরেছেন। ■

দিদিগিরিতে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

ভোটের বাজনা বেজে গেছে। আর সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার। সবাই সবার বিরুদ্ধে বলবে এটাই তো স্বাভাবিক। রাজ্যে ভোট মূলত শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপির। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দিদিমণি মনে করছেন এই ভোট আসলে দিল্লি বনাম পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্র বনাম রাজ্যের। উনি ভুলেই গেছেন ভোট দুই সরকারের মধ্যে নয়, দুই দলের মধ্যে।

বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনায় দেশের প্রতিটি প্রান্তিক ও ছোটো চাষিদের অ্যাকাউন্টে তিন দফায় বছরে ৬ হাজার টাকা পৌঁছে দেবে সরকার। মাস খানেক পরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি নিজের টুইটারে জানালেন, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের পাঁচটি রাজ্য এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে অস্বীকার করেছে।

বাজেট অধিবেশনের বক্তৃতায় পীযূষ গোয়েল ঘোষণা করেন, প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা নামে নতুন প্রকল্প শুরু করতে চলেছে সরকার। এর আওতায় যেসব কৃষকের ২ হেক্টর বা তার কম জমি রয়েছে, তাদের বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। ২ হেক্টর মানে ৪.৯৪ একর জমি। দেশের মোট ১২ কোটি কৃষক পরিবারকে এই অনুদান কেন্দ্রে নিজেই দেবে। বছরে তিন দফায় এই টাকা পৌঁছে যাবে সরাসরি।

মোদী সরকারের এই ঘোষণার ঠিক এক মাস আগে নবান্নের অলিন্দে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের আওতায় বলা হয়, যে সব কৃষকের এক একর জমি রয়েছে তাঁদের বছরে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এবং তা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। এজন্য সরকারের খরচ হবে বছরে ৭ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে কোনও কৃষক বা কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা দেবে রাজ্য সরকার।

বাজেট ঘোষণার পর কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা তো আগেই ঘোষণা করে দিয়েছি। ওরা তো আমাদের টুকলি করেছে। আমরা এক একরে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলছি। ওরা চিটিং করছে। ২ হেক্টরে ৬ হাজার টাকা দেবে বলছে। কিন্তু আগে তো সরকারে আসুক!'' পরবর্তীকালে একাধিক সভায় দাঁড়িয়ে এই কিষান যোজনা নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি লেখেন, ''রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনার সুবিধা নিতে চাইছে না। এর ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা নিজেদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'' উল্লেখযোগ্য ভাবে যে পাঁচটি রাজ্যের কথা নিজের টুইটে বলেছেন জেটলি, সেই পাঁচ রাজ্যেই বিরোধীদের সরকার রয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রের প্রকল্পের লাভ রাজ্যের মানুষকে দিতে চাইছে না বিরোধী দলগুলি, এমনটাই অভিযোগ জেটলির।

সুতরাং, বুঝতেই পারছেন দিদি একা নন। একই রকম তাঁর বন্ধুরাও। রাজনৈতিক রাগ মেটাতে নিজের রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করতেও এদের কোনও লজ্জা নেই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার শুভারম্ভ করেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী দেশের এক কোটির ও বেশি ক্ষুদ্র কৃষকদের তাঁদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রথম কিস্তি হিসেবে ২০০০ করে টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনের দিনে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে বলেছিলেন, এ এক ঐতিহাসিক দিন। এই প্রকল্পে কড়া পরিশ্রম করা ভারতের কোটি কোটি কৃষক সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

না, নরেন্দ্র মোদী একটু ভুল বলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা সেই সুবিধা পাবেন না। এর আগেও কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অনিচ্ছায়। ফের একবার।

— **সুন্দর মৌলিক**

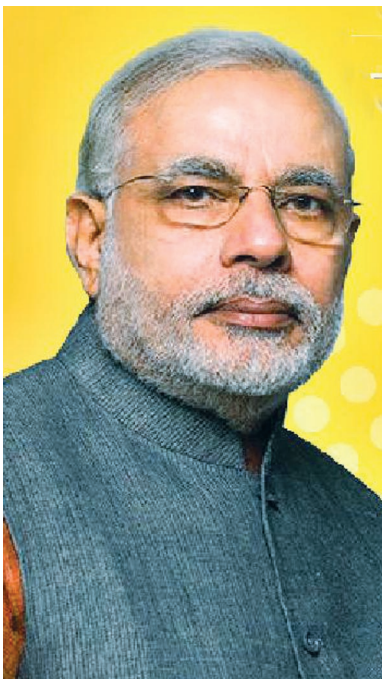
নরেন্দ্র মোদী ভারতের নবোত্থানেরই মুখ

অতিথি কলম



স্বপন দাশগুপ্ত

ভারতের প্রতিটি সংসদীয় নির্বাচনের সময়েই আবেগের এক তুঙ্গি বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। এবারের গ্রীষ্মকালীন গণতন্ত্রের এই উৎসবেও তাঁর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তবুও গণস্ফূর্তি স্বভাবতই যেহেতু দ্রুত বিস্মরণ পথচারী এবং সঙ্গে মিডিয়ার তিলকে তাল করে তোলা কর্ণভেদী প্রচার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আজকাল প্রাচীন গ্রিক গ্লাডিয়েটরদের পারস্পরিক মরোন্মুখ লড়াইয়ের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এমন এক মেরুকরণের আবহ তৈরি করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে এমন হয়তো অতীতে কখনও হয়নি। এর ফলস্বরূপ যে সমস্ত ছোটোখাটো মতপার্থক্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে মিটে যেতে পারত সেগুলি উল্টে নতুন বিভেদের জন্ম দিল। বাহ্যিক স্তর থেকে অন্তত এটা নিশ্চিত করে বলা যায় সমসাময়িক ভারতের একটা বিশেষ অংশ নিজের মতামতের প্রতিধ্বনি-ঘরে বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। সেখানে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা ও বিরোধী মতের 'প্রবেশ নিষেধ' বোর্ড ঝুলছে। তাঁরা অনেকটাই স্বয়ম্ভু প্রজাতির। এই উদারবাদীদের জীবনশৈলী অবিসংবাদিত ভাবে বিশ্ব নাগরিকের হাবভাবে ভরা। এঁরা কিন্তু ১০০ শতাংশ মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, ভারতবাসী যেন এবার কায়মনোবাক্যে মোদীকে হারানোর জন্য ভোট দেয়। মোদীকে তাড়ানোর জন্য এই যে বিপুল উদ্দীপনা তা কিন্তু তাঁর বিকল্প হিসেবে কোন নড়বড়ে জোট উঠে আসবে তা নিয়ে চিন্তা করার ব্যাপারে আদৌ নজরে পড়ছে না। তাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশে যে-কোনো ধরনের অস্থিরতাকে মেনে নিতে সর্বাংশে রাজি যদি তাঁদের চোখে এই দানবকে হটানো যায়। মূল বিষয়টি হলো, এদের যে যূথবদ্ধ 'ভারত কল্পনা' (আইডিয়া অব ইন্ডিয়া) তা আজ নিদারুণ সংকটাপন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে এসেছে 'হিন্দু ভারত কল্পনা'। পিঠ বাঁচাতে তাঁরা যে সংবিধান রক্ষার দোহাই দিচ্ছেন বা দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষণের আর্তনাদ করছেন তা আদতে উল্লেখিত দুটি ধারণা যে কোনোদিনই মিলতে পারে না তারই সংকেত। তাঁরা তাই চান এসপার-ওসপারের লড়াই।



মোদী দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় ফিরলে দেশের বৌদ্ধিক চর্চার পরিমণ্ডলে পরিবর্তন ঘটবে এবং বিগত পাঁচ বছর ধরে চলা অন্তহীন একপেশে ধারাভাষ্য বন্ধ হবে।

উল্টো দিকে যুযুধান চৌকিদারের সৈন্যদল ও তাঁর বিশাল ভক্তবাহিনী, যারা বিশ্বাস করে তাদের নেতা মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ এক মহান উচ্চতার শিখর স্পর্শের সন্ধিক্ষণে। সে কারণে ২০১৪ সালে যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি শুরুর পর আজ বেগবতী হয়ে উঠছে। তিনি না থাকলে সেগুলি সবই স্তব্ধ হয়ে যাবে। দেশ হয়ে পড়বে পশ্চাদপদ। বিগত পাঁচ বছরের অর্জিত কর্মক্ষমতা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখ উধাও হয়ে যাবে।

এঁরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন মোদীর পুনর্নির্বাচন একটি জাতীয়তাবাদী প্রকল্প যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ভারতের ক্রমোন্মচিত নিয়তি। এই নির্দিষ্ট অবধারণার পশ্চাৎপট হিসেবে গণমানসে কাজ করছে এক অনাস্বাদিত মুক্তির অনুভব। হাজার বছরের দাসত্বের তন্তুজাল ছিঁড়ে অবশেষে নিজেকে আবিষ্কার করার মধ্যে যে পূর্ণতার অনুরণন প্রবহমান তাকে অটুট রাখতে ও লালন করতে এই গরিষ্ঠাংশ আজ মরিয়া।

এর মধ্যে আবার একটি শ্রেণীগত ও সংস্কৃতিগত দিক রয়েছে। এই সূত্রে ১৯৬৭ সালে পণ্ডিত নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর একটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর এক প্রজাতির নবীন বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্যবাদের সূচনা লক্ষ্য করেছিলেন। অবলোকনটি ছিল তাঁর কথায় 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই নবীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী প্রাচীনপন্থীদের সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁদের এই অজ্ঞতা কেউ ধরিয়ে দিলে তাঁরা অন্যদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন।

হয়তো ...এমনটা মনে হয় যে এই নবীন বুদ্ধিজীবীরা নিরন্তর চেষ্টা করে দেশের চিরন্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে একটি বাহ্যিক মূল্যায়ন করেছিলেন। ঠিক যেমন কোনো ইউরোপীয় বা মার্কিনি আমাদের দেশে বসবাস করলে সাধারণত তাদের ওপর করে থাকে। এর পরিণতিতে নবীন বুদ্ধিজীবীদের ঘোষিত ধ্যানধারণাগুলি প্রত্যাশিত ভাবেই চিরায়ত প্রাচ্য দেশীয়দের চিন্তাদর্শের কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেছে। তারা এই পাশ্চাত্য ঘরানার ভারতীয়দের নিজ সংস্কারচ্যুত বা তস্কর প্রজাতির মনে করতেই পারে।'

নীরদবাবুর এই পর্যবেক্ষণ পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। আজকে নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে তুমুল মেরুকরণের পুরোধা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত সুবিধাবাদী অবস্থান। দেশের অভ্যন্তরে সংস্কৃতিগত বিভাজন বিগত ৫০ বছর ধরে দিব্যি বিদ্যমান ছিল। মোদীর উত্থানে যেটা হয়েছে যে নবীন বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখ নীরদবাবু করেছিলেন তারাই কালক্রমে প্রচলিত তথা প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও মতামত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেওয়ায় আজ হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়ে গেছেন। অসহায় বোধ করছেন।

অতীতের সেই স্বর্ণিল সময়ে যখন তাঁরা একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাধর হয়ে উঠে দেশের ধুতি পরিহিত শ্রেণীকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখতেন তাঁরাই আজ যেনতেনপ্রকারেন এটা বোঝাতে আলুথালু হয়ে যাচ্ছেন যে তাঁরাও আসলে দেশের নাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত। এই তীব্র হতাশা ও তার নিদান হাতড়াতে এক ভাই-বোনের জুড়িকে হিন্দু মন্দিরগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ১৯৯১ সালে শুরু হওয়া সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হস্তগত হওয়া শুরু হওয়ায় চিরাচরিত হিন্দু ঐতিহ্যবাদের মধ্যে এসেছে নাটকীয় পরিবর্তন। এর মধ্যে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো উপযুক্ত সুযোগ পাওয়ার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাড়বৃদ্ধি বা প্রসারণ। নবীন হিন্দু প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অত্যাধুনিক পেশার চাকরিতে সফল ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রতি তাদের বিপুল আগ্রহ। একই সঙ্গে তারা দেশের চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি দায়বদ্ধ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রতি আস্থাশীল। এই ঐতিহ্যগত দায়বদ্ধতা ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তাদের গভীরভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। মোদী এই নবোত্থানেরই মুখ। কী বেঙ্গালুরুর আনকোরা প্রযুক্তিবিদদের কাছে, কী সেই অকুতোভয় দেশীয় ১৩১ জন চাটার্ড অ্যাকাউন্টেটের কাছে যারা সদর্পে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১০৮ জন তথাকথিত অর্থনীতিবিদদের তথ্য ও তত্ত্বকে লহমায় নস্যাৎ করে বলেছিলেন 'এঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্বের কাছে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করে দেশকে কালিমালিপ্ত করতে চায়।' এটিই মোদী ইফেক্ট।

তাঁর নিবন্ধের উপসংহারে নীরদবাবু এই দ্বিপাক্ষিক বিরোধের (পশ্চিমি ধ্যানধারণার বুদ্ধিজীবী ও দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহ্যবাদীদের) পরিণতির একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছেন লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি তখনই ঘটবে--- 'could be brought about only by the complete subordination of the one to the other.'

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঐতিহ্যবাদীরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছিল কালক্রমে ভারতীয় জনজীবনে এই মতাবলম্বীরাই নির্ণায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাময়।

এই নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে খুব বেশি সময় যে লাগবে না তাও তাঁর লেখায় এসেছিল। বলা দরকার, ১৯৪৭ সালে শুরু হওয়া বৌদ্ধিক যুদ্ধের মীমাংসা একটি সাধারণ নির্বাচনে হওয়া সম্ভব নয়। তবে, এটা নিশ্চিত মোদী দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় ফিরলে দেশের বৌদ্ধিক চর্চার পরিমণ্ডলে পরিবর্তন ঘটবে এবং বিগত পাঁচ বছর ধরে চলা অন্তহীন একপেশে ধারাভাষ্য বন্ধ হবে। ■

আবেদন

সেবা ভারতী দক্ষিণ পরগনা জেলার একটি পরিচিত সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৬ সাল থেকেই নিরন্তর সমাজের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন, সংস্কারের মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছে। এই সমস্ত সেবা কাজের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টায় সেবা ভারতী দক্ষিণ বারাসতের মায়াহাউড়ী অঞ্চলে একটি জমি কেনার কথা ভাবছে। বড়ো কোনো সংকল্পকে রূপ দিতে হলে অনেক মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই সকলের কাছে সেবা ভারতীর বিনীত আবেদন যে আপনাদের উপার্জিত অর্থের যৎসামান্য ভারতমাতার চরণ কমলে অর্পণ করে এই মহতী প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করুন।

সমস্ত রকমের দান আয়কর আইনের 80G ধারা মতে কর মুক্ত

সেবা ভারতীর দঃ ২৪ পরগনার পক্ষে
শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল (সম্পাদিকা)

Bank Details :
SEVA BHARATI
A.c No. 0151013292091
IFSC Code-UTBIOSNP919
Bank-United Bank of India
Branch-Sonarpur,
PAN No. AANTS8748Q

মোদী-বিরোধী অভিযানের তির বুমেরাং হয়ে ফিরছে মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই

শৌভিক রায়

তাঁর দলের সাংসদদের ৯০ শতাংশ পার্লামেন্টে গিয়ে বসে থাকেন আর্থিক ভাতা আর প্রায় বিনি পয়সায় ক্যান্টিনের পাঁচ কোর্স লাঞ্চ ডিনারের জন্য। তাদের মুখে মোদী বিরোধী কোনও অভিযোগ শোনা যায় না পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে। অথচ ভোটের সময় নেত্রীর মুখে অভিযোগের বান ছুটেছে। সবই প্রথামুখী। তিরের লক্ষ্য একজনই --- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর দলের কথা। গত দু' মাস ধরে তিনি ঘ্যানঘেনে বর্ষার মতো কিছু অভিযোগ কপচে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। একঝলক দেখে নেওয়া যাক। অভিযোগগুলো কেমন?

১। মোদী সাম্প্রদায়িক। গোটা দেশে তিনি দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছেন।

২। সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে মোদী কিনে নিতে চাইছেন।

৫। সত্যি কথা বললে, সমালোচনা করলেই সিবিআই, ইডি-র ভয় দেখানো হচ্ছে। নিরাপরাধদের ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে।

৬। মিথ্যা খবর ছড়ানো হচ্ছে।

৭। ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে দেশজুড়ে।

৮। গো-রক্ষার নামে, ধর্ম ও বর্ণের নামে গণপিটুনিতে কতজন মারা গেছে তার হিসেব নেই।

৯। কেন্দ্রীয় বাহিনী দেশরক্ষা ছেড়ে বিজেপি নেতাদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত।

১০। বিজেপি, মোদী আমাকে ভয় পায়। তাই মানসিক রোগীর মতো আচরণ করছে।

১১। কোটি কোটি টাকা চার্টার্ড বিমানে করে রাজ্যে আনার চেষ্টা চলছে।

১২। পশ্চিবঙ্গকে অপমান করছে বিজেপি, ইতিহাস বদলে দিতে চাইছে। কারণ মোদী চেঙ্গিস খান, হিটলার আর মুসোলিনির চেয়েও ভয়ংকর। অভিযোগের পাশাপাশি তার কিছু দাবিও আছে। যেমন :

(১) রাজ্যে রাজ্যে সমান্তরাল প্রশাসন চালানো যাবে না।

(২) রাজ্য থেকে যত টাকা তুলবে তার ভাগ দিতে হবে। মায় আয়কর, কাস্টমস আর সেসের ভাগও।

(৩) রাজ্য থেকে টাকা তুলে কেন্দ্রের নামে প্রকল্প তৈরি করে প্রচার বন্ধ করতে হবে।

(৪) পোস্ট অফিসকে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় প্রচারপত্র পাঠানো যাবে না।

(৫) কৃষক ভাতা বা অন্যান্য ভাতা সরাসরি কারও অ্যাকাউন্টে পাঠানো বন্ধ করে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে তা বিলি করতে হবে।

যে কোনও সচেতন মানুষ মাননীয়ার অভিযোগগুলি একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আসলে অভিযোগগুলি তাঁর নিজেরই বিরুদ্ধে। যা তিনি অবচেতন মনে নিজের বিরুদ্ধেই ছুঁড়ছেন এবং জনগণও যে অভিযোগগুলি তুলছেন প্রতিদিন তাঁরই বিরুদ্ধে। মোদী সাম্প্রদায়িক। কীভাবে তা বলছেন না। কারণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সব পরিচয়টুকুই তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন হিজাব পরে নমাজ পড়ে, ধুলাগড়-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে দলীয় সংখ্যালঘু নেতাদের দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে, হিন্দু সংখ্যাগুরু জনগণকে দূরে ঠেলে বেআইনি সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই দিয়ে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক তৈরির স্বার্থে। আবার বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে কোথাও কোথাও অতি হিন্দু হয়ে গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন কিংবা ৬০ কেজি বেলকাঠ আর ৮ কেজি ঘি পুড়িয়ে '৪২-এ ৪২'-এর যজ্ঞ করছেন। তিনি মুসলমান অপরাধীদের পাশে দাঁড়ান বন্ধুর মতো। মুসলমান ধর্ষক যুবককে বিদেশে পালানোর সুযোগ দেন, আবার তারই বান্ধবীকে লোকসভায় নিজ দলের প্রার্থী করেন। এমনকী সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে পাক-সন্ত্রাসবাদীদেরও পরোক্ষে সমর্থন করেন। তাহলে সাম্প্রদায়িক কে? হ্যাঁ ঠিক কথা, মোদী স্বামী বিবেকানন্দের মতোই সগর্বে বলেন— 'আমি হিন্দু'। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ছদ্মবেশ ধরে মেকি মুসলমান সাজার চেষ্টা করেন না। হিজাব আর বোরখা পরলেই, লা-ইল্লাহ-রসুলাল্লা বললেই মুসলমান হওয়া যায় না সেটা তো এখন মুসলমানরা তাঁকে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছেন। তিনিই তো ইমাম ভাতা দেন। পুরোহিত ভাতা, যাজক ভাতা দেন না। তিনিই তো সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য বিশেষ স্কলারশিপ দেন। গরিব হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা তো পায় না। তাহলে সাম্প্রদায়িক কে?

মোদী দেশদ্রোহী? কেন? তিনি কি মমতা

বিদেশি অর্থ মুসলমান জঙ্গিসংগঠনের মাধ্যমে এই রাজ্যে ঢুকছে এমন ইঙ্গিত ই ডি আগেই দিয়েছে। এবার প্রমাণ হবে— ওই অর্থের গন্তব্য কোনদিকে? কালীঘাটের দিকে নয়তো?

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সেনাবাহিনীর রক্ত নিয়ে ভোটের রাজনীতি করেছেন? বরং তিনি ওই রক্তের প্রতিশোধ তুলতে উড়িয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন, সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেনাবাহিনীর সেই অসামান্য সাফল্য নিয়েই। তাহলে দেশদ্রোহী কে? মোদী? নাকি আপনি নিজেই মাননীয়া? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই গোটা পশ্চিমবঙ্গ জিহাদিদের খোলামেলা আস্তানা হয়ে উঠেছে। বিশ্ব বাংলা এখন পাক ও বাংলাদেশি জঙ্গিদের মুক্ত বিশ্ব করিডোর। প্রতিটি মাদ্রাসা এক একটি জঙ্গি ঘাঁটি। প্রতি মাসে ৭০০ কোটি টাকা নাকি ঢুকছে চোরাপথে--- বলছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। গত সাত বছরের তৃণমূল রাজত্বে যত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তাঁর সিংহভাগের সঙ্গে জড়িত ছিল মুসলমান জনগণ। অস্বীকার করতে পারবেন মাননীয়া? মোদী নাকি সুপার ইমার্জেন্সি জারি করেছেন। যদি সত্যিই করতেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার লাটে উঠত। বরং প্রকারান্তরে পশ্চিমবঙ্গেই স্বৈরাচার কায়েম করতে মুখ্যমন্ত্রী আপনি সদলে মস্তানরাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে বাক-স্বাধীনতা নেই। এখানে এক রাতেই জলজ্যান্ত একটা ছবি সিনেমা হল থেকে উধাও। বাংলাকে অপমান করছে বিজেপি? ইতিহাস বদলে দিতে চাইছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিই মাথাটা গেছে। তিনি যে মানসিক অবসাদের রোগী (এক অর্থে প্যারানয়েড) সে কথা তো মনোবিদ মাত্রেই বলে থাকেন। না, মোদী বা বিজেপি-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এমন রোগের লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি। তাই তাঁদের বাংলাকে অপমান করা বা ইতিহাস বদলানোর কোনো প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে না। আসলে মনে রাখবেন বিজেপির উত্থান একটা শিক্ষা, একটা সংস্কৃতির শিকড় ধরে— সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সেই হিন্দু মহাসভা বা সেই জনসঙ্ঘ যে দলের আঁতুড়ঘর যারা ইতিহাসকে সম্মান জানাতে জানে। যারা হিন্দু সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে জানে। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনও ভুঁইফোড় সংগঠন নয় যার কোনো সংস্কৃতি



নেই, সংবিধানও নেই। ইতিহাসের পাতায় আঁচড় কাটছেন তো মুখ্যমন্ত্রীই। তা না হলে নন্দীগ্রাম আন্দোলন কীভাবে সূর্যোদয়ের আন্দোলন হয় আর সিঙ্গুর আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলন হিসেবে স্কুলপাঠ্য বইয়ের সিলেবাসে ঠাঁই পায়? ৩৪ বছর বামশাসনের পর যিনি মাওবাদীদের ডানায় ভর করে ক্ষমতা দখল করে সেই মাওবাদীদেরই নিকেশ করতে পারেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলছেন, মোদী নাকি চেঙ্গিজ খান। মোদী নাকি হিটলার, মুসোলিনি। আবার গব্বর সিংহও। সন্দেহ হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে মিথ্যার আশ্রয় নেই। অন্যায়ের আশ্রয় নেই। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনার শমন এবার হাজির হতে চলেছে সত্যের জয় পতাকা নিয়ে। আর বেশি দেরি নেই নতুন সূর্যোদয়ের।

করেছেন কিনা। যদি এখনও পর্যন্ত না করে থাকেন, ভবিষ্যতেও করবেন না। কারণ, নিজেই ভয় পেয়ে যাবেন নিজেকে দেখে। কী কদাকার। কী ভয়াবহ! কী বীভৎস স্বৈরাচারী মুখশ্রী আপনার। সম্ভবত আপনিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা স্বৈরতন্ত্রী যিনি নিঃশব্দে জনগণকে ডাইনির মতো গ্রাস করে তারপর নিমেষে নিধন করে দেন আত্মসন্তুষ্টির খেলায়। আবার দেখুন, মমতাদেবী নিজেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম ইচ্ছেমতো পাল্টে দিচ্ছেন। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প হয়ে গেল মিশন নির্মল বাংলা। আবার নিজেই বলছেন, কেন্দ্রের সমান্তরাল প্রশাসন চালানো যাবে না। সংবিধান মেনে কেন্দ্র দরকার হলে সমান্তরাল প্রশাসন চালাবে। দরকার হলে সংবিধান মেনে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকেও দেবে কেন্দ্র। টাকা খরচ করবেন, হিসাব দেবেন না, আর চিৎকার করবেন প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না কেন্দ্র। কেন ম্যাচিং গ্রান্ট শব্দটা বোধহয় শোনেননি, শুনলেও বোঝার চেষ্টা করেননি মাননীয়া কখনও। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অর্থটাই বোঝেন না উনি। তাই গলাবাজি করেন রাজ্য থেকে টাকা তুলে কেন্দ্রের নামে প্রকল্প করা যাবে না। পোস্ট অফিসকে কেন্দ্র ব্যবহার করতে পারবে না। এগুলো পাগলের প্রলাপ বলে এড়িয়ে গেলে ভুল হবে। কারণ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জানেন, এসব অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হাওয়া হয়ে যায়। এখানে খোলা হাওয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই কোনো প্রবন্ধ লিখলে, গান গাইলে, কবিতা লিখলে এমনকী ব্যঙ্গচিত্র

আঁকলেও মাননীয়ার অনুপ্রেরণা আবশ্যিক। এ রাজ্যের সংবিধান গত সাত বছর ধরে সেটাই বলতে চেয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ? এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে দক্ষ বিশ্ব রাজনীতিতে কেউ আছেন? পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মিডিয়া কর্তৃপক্ষকে চাবুক মেরে মেরে নিজের পায়ে আছড়ে ফেলেছেন। একদল সাংবাদিককে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির শিকার করে বাকি সাংবাদিকদের ওপর শাসানি চালাচ্ছেন। প্রেস কার্ড পেতে গেলে অলিখিত শর্তে রাজি হতে হচ্ছে যে সরকার এবং শাসকদল বিরোধী হওয়া যাবে না। লিখতে হবে, বলতে হবে মোদীর বিরুদ্ধে। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার বা আপনার দলের বিরুদ্ধে কিছু পোস্ট করলেই চালান সোজা থানায়। এত ব্যাপক মিডিয়া সন্ত্রাস বোধহয় আই এস আই এসও করেনি কখনও। মোদী নাকি সিবিআই, ইডি-র ভয় দেখাচ্ছেন। ভয় দেখাবেন কেন? চোর চুরি করলে পুলিশ ধরবে, চিটফান্ডের টাকায় রাজনীতি আর নবাবি করলে সিবিআই, ইডি ধরবে— এটাই তো আইন। মাননীয়ার আপত্তি কেন? ধরা পড়বেন, সেই ভয়ে? আসলে, 'ভয়ের পরিবেশ'টা আপনিই ছড়াচ্ছেন মমতাদেবী। আর সেজন্যেই সিবিআই অফিসারদের ওপর চড়াও হতে নির্দেশ দেন কলকাতা পুলিশকে। চিট ফান্ড অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ কমিশনার, আপনার পাপোশ মুখ্যসচিব (যিনি ম্যাডাম নামে এত বেশি দুঃস্বপ্ন দেখেন যে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকেও 'ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করে ফেলেন)-কে সঙ্গে নিয়ে বসে পড়েন রাজপথের ধর্নায়? আপনার প্রিয় পোষ্য অনুব্রত মণ্ডলকে (যিনি অক্সিজেনের অভাবে ভোগেন) দিয়ে চড়াম চড়াম ভোটের বাদ্যি, গুড়-বাতাসা জল, নকুলাদানা আর পাঁচনের বাড়ি খাওয়ানোর ভয় দেখান ভোটারদের?

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, গোরক্ষার নামে নাকি গণপিটুনি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। জেনে রাখুন, আপনার মিথ্যা প্রচারের জন্যই গোটা উত্তরপ্রদেশে সপা-বসপা জোট ধাক্কা খাচ্ছে। জয়ধ্বনি উঠেছে মোদীর। মিথ্যা বলতে বলতে আর খেই রাখতে পারছেন না ভদ্রমহিলা। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ দেখে ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে ফেলছেন— কেন্দ্রীয় বাহিনী নাকি বিজেপি নেতাদের রক্ষা করতেই ব্যস্ত। আজ্ঞে জেনে রাখুন সেন্ট্রাল ফোর্স আপনার কলকাতা পুলিশ নয় ম্যাডাম।

টাকা আনছে বিজেপি? ভোট কিনতে? আসলে ওই ছকটা যে তৃণমূলের তার রেকর্ড আশা করি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনীর কাছে আছে। বিদেশি অর্থ মুসলমান জঙ্গিসংগঠনের মাধ্যমে এ রাজ্যে ঢুকছে এমন ইঙ্গিত ই ডি আগেই দিয়েছে। এবার প্রমাণ হবে— ওই অর্থের গন্তব্য কোনদিকে? কালীঘাটের দিকে নয়তো? প্রমাণ করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা তাঁর এবং তাঁর দলের কোনোদিনই হবে না। কিন্তু তিনি জানেন, গলাবাজিটা করে গেলে ভোটটা কিছুটা পাওয়া যাবে। কারণ মিথ্যা কথা যদি প্রতিদিন প্রচারে রাখা যায়, তাহলে কিছু মানুষ তা সত্য বলেই ধরে নেবেন।

এই চালাকি এবং এই ভাঁওতাবাজির খেলা খেলতে খেলতে আজ তিনি উলঙ্গ হয়ে গেছেন। মানুষের কাছে তাঁর স্বরূপ আজ প্রকাশ্যে প্রতীয়মান। এমনকী মুসলমান জনগোষ্ঠীও তাঁকে চিনে ফেলেছেন, ভোটবাক্স ভরানোটাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য, হিজাব পরে, বোরখা পরে নমাজ পাঠটা ছিল নাটক।

আজ যখন গোটা ভারতবর্ষের দরজায় সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই মিথ্যা প্রচার সর্বস্ব রাজনীতির মুখোশটা ছিড়ে দেওয়া দরকার। তার জন্য সবাইকে মোদী সমর্থক হতে হবে না। তার জন্য সবাইকে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে না। অন্তত, সত্যের স্বার্থে প্রতিবাদটা হোক। ঠিক যেভাবে প্রতিবাদ করেছেন চিত্রপরিচালক অনীক দত্ত। যেমন প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছেন শিক্ষকতার চাকরির সফল দাবিদাররা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। যেমন করে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কার্টুন চিত্র, ব্যঙ্গচিত্র, হাসির কবিতার খোরাক হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। শ'য়ে শ'য়ে অম্বিকেশ মহাপাত্র জন্ম নিয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে 'আমরা আক্রান্ত'-র মতো প্রতিবাদী সংগঠন। ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে পল্লব কীর্তনিয়ার মতো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তারা খসছে আকাশ থেকে প্রতিদিন একটি একটি করে। প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে।

এবার অন্তত প্রকৃত সত্যটা উঠে আসুক। ইতিহাসের পাতা থেকে প্রবঞ্চকের ইতিহাস মুছে দিয়ে লেখা হোক সত্যের অধ্যায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে মিথ্যার আশ্রয় নেই। অন্যায়ের আশ্রয় নেই। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনার শমন এবার হাজির হতে চলেছে সত্যের জয় পতাকা নিয়ে। আর বেশি দেরি নেই নতুন সূর্যোদয়ের। সে সূর্যের রঙটা চেনেন তো? বোধহয় না। কারণ ভোরে ওঠার অভ্যাস তো আপনার নেই। ▌

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

পাঁচ বছরে অসাধ্য সাধন করেছেন নরেন্দ্র মোদী

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

এতদিন বিশ্বাস হতো না, মনে হতো এসবই বাজে কথা। দেশের খেয়ে, দেশের পরে, দেশের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা, সব অধিকার ভোগ করছে যারা, তারা কখনই পাকিস্তানের প্রতি প্রেমাসক্ত হতে পারে না। কিন্তু হা হতস্মি! সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে দেশের অভ্যন্তরে পাকপ্রেমীর অভাব নেই।

প্রথমেই প্রধান বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর দিকে তাকানো যাক। এই নেতা মাসের পর মাস বিভিন্ন সভাসমিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গালি দিয়ে চলেছেন। মোদীজীকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া তাঁর আর কোনও বক্তব্য থাকে না। রাফাল নিয়ে মাসের পর মাস চীৎকার করে রাহুল মানুষের কান ঝালাপালা করে দিয়েছেন। কিন্তু কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেননি, এমনকী সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রাফাল কেস প্রমাণ নেই বলে বাতিল করে দিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা মোদী সরকারের নির্দেশে পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে বালাকোটে গিয়ে সেখানকার জয়েশ-ই- মহম্মদের ডেরায় ওপরে বোমা মেরে ডেরা উড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে। রাহুল গান্ধী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা প্রমাণ চাইছে ওই এয়ার স্ট্রাইকের।

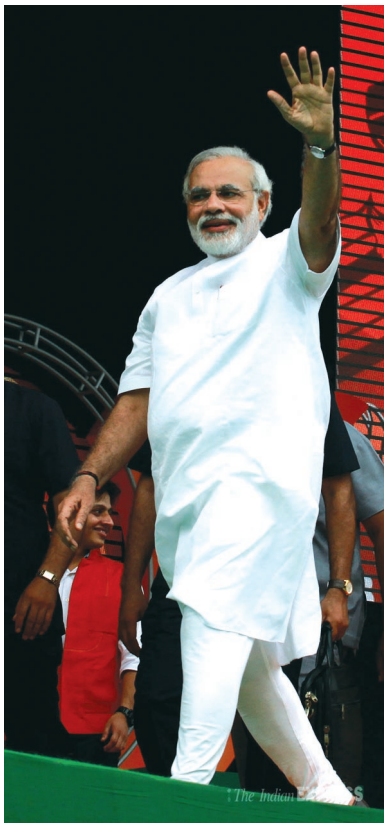
অতি সম্প্রতি রাহুল গান্ধী পুলওয়ামার আক্রমণকারী জইশের মূল পাণ্ডা মাসুদ আজহারকে সম্মান জানালেন, তাকে মাসুদ আজহার'জী' বলে উল্লেখ করলেন এক সভায়। সেই সঙ্গে দেশের ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাডভাইজার অজিত দোভালের সমালোচনা করলেন। তাঁর কথায়— 'অজিত দোভাল মাসুদ আজহারজী কো কান্দাহার মে জা কর পাকিস্তানকে হাওয়ালে করকে আয়ে থে।' তাঁর সম্ভবত মনে ছিল না অথবা তাঁর ট্রেনাররা বলতে ভুলে গিয়েছিল আসল ব্যাপারটা। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভারতের একটি প্লেন হাইজ্যাক করে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট কিছু আতঙ্কবাদী কান্দাহার নিয়ে যায়। সেই সময় অজিত দোভাল ছিলেন আই বি চিফ। সরকার একটি চার সদস্যের নেগোশিয়েটিং টিম তৈরি করে, যে টিমের লিডার অজিত দোভাল তাঁর টিম নিয়ে কান্দাহার যান। ওই প্লেনে ১৭১ জন যাত্রী এবং কর্মী ছিলেন নারী ও শিশু সমেত। সরকার ওই ১৭১ জন ভারতীয় এবং অবশ্যই

দেশকাল

নিরীহ যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মাসুদ আজহারকে ছেড়ে দিয়েছিল। সরকার অতগুলি নিরীহ মানুষের মৃত্যু চায়নি। দোভাল এরপর মাসুদ আজহারকে কান্দাহার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের শর্ত অনুযায়ী। যেহেতু তখন কেন্দ্রে ছিল বিজেপি সরকার, তাই রাহুল গান্ধী ঘটনার অগ্রপশ্চাৎ উল্লেখ না করে শুধু আজহারকে ছেড়ে দেবার কথাই উচ্চকণ্ঠে বলে চলেছেন। এবং আজহারকে তিনি আজ মাসুদ আজহারজী বলে সম্মান জানাচ্ছেন। অবশ্য তাঁর দলের সিনিয়র নেতারা টেররিস্টদের এর আগেও প্রচুর শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়েছেন, যেমন দিগ্বিজয় সিংহ ওসামা বিন লাদেনকে 'ওসামাজী', সুশীল সিন্ধ্রে বলেছেন 'হাফিজসাব'। যে হাফিজ সইদ মুম্বই আক্রমণের মাস্টার মাইন্ড, তাকে সম্মান জানাতে এদের কোনও দ্বিধা সংকোচ নেই।

রাহুল গান্ধীদের কাছে পাকিস্তান- লালিত টেররিস্টরা সম্মাননীয় ব্যক্তি আর নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আন- পার্লামেন্টারি শব্দ ব্যবহার করে অসম্মান করছেন, সমানে বলে চলেছে সর্বত্র— 'চৌকিদার চোর হ্যায়।' মানুষ যে তার কথা বিশ্বাস করছে না, সেটা বোঝার ক্ষমতাও এই নির্বোধ, বালখিল্য নেতার নেই।

বালাকোট আক্রমণের ছবি, যেগুলি



> মোদী-বিরোধীরা এখন আর বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীদের নাম উচ্চারণ করে না, এতদিন এই নামগুলি নিয়ে এরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছে। এখন চুপ, কারণ মোদী সরকার এদের ভারতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, সেসব দেখার পরেও এরা বলছে 'প্রমাণ চাই।' সেনাকর্তারা এভিডেন্স দেখিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও পাওয়া গেছে, টেলিভিশনের পর্দায় আমরা সকলেই দেখেছি ও শুনেছি। তা সত্ত্বেও পাক- প্রেমীদের

আওয়াজ থামছে না, 'কতজন মারা গেছে জানাও'। এইসব কথা পাকিস্তানের মিডিয়া মহাউৎসাহে প্রচার করে চলেছে। তাদের সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় ভারতের পাক-প্রেমীদের কথা বড়ো বড়ো অক্ষরে ছেপে বেরোচ্ছে। অন্য কোনও দেশ হলে এইসব ঘরের শত্রুদের সঙ্গে সঙ্গে জেলে পুরে দেওয়া হতো।

পাকিস্তান সরকার পৃথিবীর সব মিডিয়াকে বালাকোটে ঢোকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়। সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি যে ভারতের এয়ার ফোর্স গুড়িয়ে দিয়েছে, সেটা ওরা বহির্বিশ্বকে জানতে দিতে চায় না। অথচ ভারতের অভ্যন্তরের পাক-প্রেমীরা প্রমাণ চাইছে। এর দ্বারা যে দেশের মিলিটারির মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে পারে, সেই বোধটা এই রাষ্ট্রবিরোধীদের নেই। কুখ্যাত সন্ত্রসাবাদীদের 'জী' বলে সম্মান জানানো লোকগুলির কি ভারতে থাকার অধিকার আছে?

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে রাহুল গান্ধী কুখ্যাত আইএসআইএস জঙ্গিদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন বেকার ছেলেরা চাকরিবাকরি না পেলে আইএসআইএস-এ জয়েন করে। এটা কি একধরনের টেরর-অ্যাপিজমেন্ট নয়? তার দলের নেতারাই বলেছে ২৬/১১-তে যে মুম্বই অ্যাটাক হয়েছিল, সেটা আর এস এস করিয়েছিল। মাওবাদীদের প্রতি এদের দরদের অন্ত নেই। মাওবাদীরা নাকি মোটেই সন্ত্রাসবাদী নয়, তারা হচ্ছে বিপ্লবী। 'ক্রান্তিকারী' কুখ্যাত জাকির নায়েককে এরা বলে 'শান্তির দূত'। ইশরাত জাহানকে বলে একটি নিরীহ মেয়ে। পরে অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সে ছিল একটি প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ভারত বিরোধী জঙ্গি সেনা, সে কারণেই তাকে মারা হয়। কংগ্রেস দল আফজল গুরুকে আজও 'গুরুজী' বলে থাকে, বিশ্বাস হয়? বাটালা হাউস এনকাউন্টারের পরে খবর শুনে সোনিয়া গান্ধী নাকি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। যেখানে পুলওয়ামার বীভৎস ঘটনার পর সেই সিআরপিএফ জওয়ানদের পরিবারের কান্না আজও কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, তখন ওই আক্রমণের মূল পাণ্ডা মাসুদ আজহারকে 'মাসুদ আজহার জী' যারা বলতে পারে, তাদের ভারতে থাকার কোনও অধিকার নেই। আসলে এদের মনের মধ্যে যে পাক-প্রেমের বন্যা বইছে, সেটা মাঝে মাঝে মুখের ভাষায় চলে আসে। হিন্দীতে একটা কথা আছে— 'দিল কি বাত যো হ্যায়, জুবান পে আহী যাতা হ্যায়।" এদেরই দলের, শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপ দীক্ষিত, ভারতীয় সেনাপ্রধান রাওয়াতকে 'সড়ক কা গুন্ডা' বলেছিলেন। শশী থারুর, যার বিরুদ্ধে পত্নীহত্যার মামলা চলছে, সেই ব্যক্তি বলছে যে জহরলাল নেহরুর দৌলতেই নাকি এক চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছে। এইসব লোকজনদের করুণা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই।

ইলেকশন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা চীৎকার শুরু করে দিল— ''রমজান মাসে ভোট করা চলবে না, তাহলে মুসলমান ভোটাররা কেউ ভোট দিতে আসতে পারবে না ইত্যাদি। কী হাস্যকর যুক্তি! রমজান মাসে মুসলমানরা কি সব বাইরের কাজকর্ম বন্ধ রাখে? আসাদুদ্দিন ওয়েসি যেই বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে রমজান মাসে মুসলমানরা আরও বেশি করে ভোট দিতে যাবে, তারপর দেখা গেল বিরোধীদের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।

সম্প্রতি জানা গেল যে রাহুল গান্ধী এক বিশাল জমি ঘোটালায় যুক্ত আছেন। তিনি এইচ এল পাওয়া নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৬.৩ একর জমি কিনেছিলেন। এই পাওয়ার বাড়িতে একবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জানা দিয়েছিল। এ হেন পাওয়া ওই একই জমি ৪০০ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে কিনে নেয়। রাহুল গান্ধীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান যে ওই জমি তিনি তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাঢরাকে গিফট করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রিয়াঙ্কাই ৪০০ শতাংশ প্রফিট করেছে ওই জমি বিক্রি করে। পাওয়া জানিয়েছে যে তার কাছে টাকা পয়সা ছিল না, তাকে পি.সি. থাম্পি ধার দিয়েছিল পঞ্চাশ লাখ টাকা। এই থাম্পি ইউপিএ জমানায় পেট্রোলিয়ামের দালালি পেয়েছিল। সঞ্জয় ভাণ্ডারী নামে এক কুখ্যাত আর্মস্ ডিলার এদের খুবই ঘনিষ্ঠ। রাহুল গান্ধীর জামাইবাবু রবার্ট বাঢরাকে এই ভাণ্ডারী লন্ডনে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জমির ঘোটালা ল্যান্ডডিল স্ট্যাম্প পেপারেই করা হয়েছিল। থাম্পি ও ভাণ্ডারী রাহুল গান্ধী ও রবার্ট ভাডরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এরা চারজন মিলেই এই জমি ঘোটলা করেছে। এদেরকে জমি-হাঙ্গর বললে অত্যুক্তি হয় না। আমেথীতে গরিব কৃষকদের জমি রাহুল গান্ধী ছলে-বলে- কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো যে একটি জমি একজন ব্যক্তি যে দামে বিক্রি করে দিল, তার ৪০০ গুণ বেশি দাম দিয়ে ওই একই জমি সে কিনে নিল, ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য? রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন যে তিনি জমিটা বোন প্রিয়াঙ্কাকে গিফট্ করে দিয়েছিলেন। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে এই জমি ঘোটলায় প্রিয়াঙ্কা ভাডরাও জড়িত। যে রাহুল ও সোনিয়া দুজনেই দুর্নীতির কারণে ধরা পড়ে জামিনে খালাস আছেন, তারা, বিশেষ করে রাহুল গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চোর বলেন কোন মুখে? তাদের বাড়ির জামাইটি অতি গুণধর, সে চাকরি করে না, ব্যবসা করে না, অথচ সে হাজার কোটির মালিক হয়ে বসেছে। হরিয়ানা ও রাজস্থানে একরের পর একর জমির মালিক সে। সেও এখন জামিনে খালাস আছে। এই তো কংগ্রেস দলের চেহারা, এই দল থেকে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশটা জাহান্নামে যাবে এবং ভারতের জনগণ সেটা আজ বুঝে ফেলেছে।

মোদী-বিরোধীরা এখন আর বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীদের নামও উচ্চারণ করে না, এতদিন এই নামগুলি নিয়ে এরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছে। এখন এরা চুপ, তার কারণ মোদী সরকার এদের ভারতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে, শীঘ্রই আমরা এই দুজন ব্যাঙ্কলুঠেরাকে দেশের জমিতে দেখতে পাবো। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসাধ্য সাধন করেছেন, বিরোধীদের মুখবন্ধ করতে পেরেছেন নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অব্যর্থ ডিপ্লোম্যাসির সাহায্যে। ■

ভারতের অখণ্ডতার জন্যই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি প্রয়োজন

প্রতিবেশী দেশ

রঞ্জন কুমার দে

শিক্ষার আলো কখনো ধর্মান্ধদের চোখের পর্দা সরাতে পারে না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাকিস্তান। দোষ শুধু জঙ্গিদের কেন হবে? সে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেনা প্রধান, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ সবার একই মানসিকতা অর্থাৎ শেষ কথা জঙ্গিপনা। হ্যাঁ, কিছু ভালো মানুষ আছেন, তাঁরা শতাংশের হিসেবে পড়েন না। আমরা ভারতীয়রা ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না কিন্তু তাদের বিশ্বাস পাকিস্তান যেহেতু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং ইসলাম সর্বোপরি। পাকিস্তানে ছোটোদের কোমল মনে হিংসার বীজ রোপণ করে শেখানো হয় হিন্দু এবং হিন্দুস্থান পাকিস্তানের প্রধান শত্রু। ফলস্বরূপ পাকিস্তানের মাদ্রাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের আতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। তাদের জাতীয়তাবাদ মানে ইসলাম, দেশাত্মবোধ মানে জঙ্গিপনা।

এক টিভি অনুষ্ঠানে সঞ্চালিকা রুবিনা লিয়াকতকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সৈয়দ তারেক পিরজাদা মুখের উপরে বলে দেন পাকিস্তানের একটাই উসুল, সেটা 'ইসলাম'। সেখানকার রেলমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন ভারতের পাখিরা আর ডাকবে না, মন্দিরে কোনো ঘণ্টা বাজবে না। ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা কাণ্ডে আমরা প্রায় অর্ধশত সেনাভাইদের হারিয়েছি। হ্যাঁ আমরা অবশ্যই কড়া বদলা চেয়েছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানের বরবাদি চেয়ে কেউ তো বলেনি পাকিস্তানের সব মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। তাহলে পাকিস্তানের রক্তে এতো হিন্দু বিদ্বেষ কেন? ভাবা যায় সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থার কী করুণ পরিণতি হতে পারে! অথচ এই ভণ্ডরা হিন্দুস্তানকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পাঠ শেখায়। সৌজন্যে অবশ্যই আমাদের আমির, নাসিরের মতো মহানুভবরা। ১৯৭১-এ আমরা বর্তমান বাংলাদেশকে পাকিস্তানের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে দেখা যায় বেশিরভাগ বাংলাদেশি ধর্মের জিগিরে ভারতকে চরম শত্রুর আসনে বসিয়ে পাকিস্তানের অন্ধভক্ত হয়ে আছে। পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও তাদের পঞ্চম শ্রেণীর 'ইসলাম ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা' পাঠ্য বইয়ের ১৬ এবং ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় অমুসলিমদের মিথ্যাবাদী, সম্পদ আত্মসাৎকারী, এমনকী 'পশুর চেয়ে অধম' হিসাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।



আদিল আহমেদ দার

কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মিল রয়েছে, সেটা জঙ্গিপনার জন্য ধর্মের ব্যবহার। কুখ্যাত হাফিজ সাঈদ যেভাবে পাকিস্তানের মসজিদগুলোতে জুম্মাবারে মৌলবাদীদের ধর্মের নামে ব্রেন ওয়াশ করে, সেভাবে আমাদের কাশ্মীরেও বিচ্ছিন্নবাদীরা উপত্যকার যুবকদের ধর্মের নামে সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা এবং সন্ত্রাসবাদ শব্দদুটি একে অন্যের পরিপূরক। সম্প্রতি পুলওয়ামা সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৌলানা মাসুদ আজহার নিয়ন্ত্রিত 'জৈশ-ই-মোহাম্মদ' দায় স্বীকার করেছে। এই মাসুদ আজহারকে প্রথমে ১৯৯৪ সালে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হরকত-উল- মুজাহিদিনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর প্রায় ৫ বছর পরে সন্ত্রাসবাদীরা ১৯৯৯ সালে ১৮০ জন যাত্রী-সহ একটি ভারতীয় বিমান নেপাল থেকে অপহরণ করে কান্দাহারে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা 'কান্দাহার বিমান কাণ্ড' নামে বেশ সুপরিচিত। পণবন্দি এই বিমান যাত্রীদের বিনিময়ে তখন ভারত সরকারকে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজহার-সহ অন্য দুই জঙ্গিকে ছেড়ে দিতে হয়। তারপর মাসুদ ২০০০ সালে জৈশ-ই-মহম্মদের সৃষ্টি করে। মাসুদের এই

সংগঠনে শামিল হয় হরকত-উল-মুজাহিদিন এবং হরকত-উল- তাংজাম-এর মতো বিষাক্ত সংগঠন।

মূলত ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলা বৃদ্ধি করা এবং কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করাকেই এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলস্বরূপ ২০০১ সাল থেকে সংসদ হামলা, জম্মুকাশ্মীরের সচিবালয়ে হামলা, ২৬/১১ মুম্বই হামলা, ২০১৬-তে পাঠানকোট হামলা, উরি হামলা, আর সম্প্রতি পুলওয়ামা হামলা। ভারত চায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ঘোষণা করুক। কিন্তু চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ায় বারংবার ভেটো প্রয়োগে মাসুদকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। এইবারও মাসুদকে চীন বাঁচিয়েছে। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ৫১ বিলিয়ন ডলারের 'One road one bolt'-এর মতো অনেক পারস্পরিক যোজনা রয়েছে। তাই চীন পাকিস্তানকে বাঁচাতে চায়। ১৯৫০ সাল থেকে চীন তিব্বত দখল করে আছে। পাকিস্তানের প্রতি চীনের সহমর্মিতার উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে পাকিস্তানকে কবজা করা।

চীনের পাকিস্তানের প্রতি অনেক কারণে দুর্বলতা থাকতেই পারে, কিন্তু পুলওয়ামা কাণ্ডের পর কিছু মুসলমানের দেশদ্রোহী চরিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্র থেকে শুরু করে গুয়াহাটি আইকন কর্মার্স কলেজের অধ্যাপিকা-সহ আমাদের আনাচে কানাচে কত লোক যে এই দেশদ্রোহিতায় শামিল হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তবে প্রশংসনীয় যে প্রশাসন কড়া হাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের এই চরম মুহূর্তে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। বিরোধীরা পাশে থাকার অভয় দিলেও শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য রাখতে পারেনি। এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল ইমরান খানের স্পোক পার্সন হয়ে দেশের কিছু নেতা-নেত্রীরা ভাষণ দিচ্ছেন। পাকিস্তান সরকারকে যতই জঙ্গিবাদের প্রমাণ দেওয়া হোক না কেন, কোনো সদর্থক ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে না। কারণ পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর। তাই পাকিস্তানকে প্রথমে কুটনৈতিক পর্যায়ে ঘায়েল করা অত্যন্ত

পুলওয়ামা কাণ্ডের আত্মঘাতী জঙ্গি ছিল কাশ্মীরের বাসিন্দা আদিল আহমেদ দার। এতো বিস্ফোরক পাকিস্তান থেকে উড়ে আসেনি। সম্পূর্ণ মদত জুগিয়েছিল কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার সুবিধাভোগীরা। তাই হাফিজ সাঈদ, মাসুদ আজহারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অভিশপ্ত ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি সর্বসম্মতিক্রমে ঘটিয়ে দেশদ্রোহীদের চরম জবাব দেওয়া হোক।

অত্যাবশ্যকীয় ছিল। পাকিস্তানকে দেওয়া মোস্ট ফেভারিট নেশনের তকমা কেড়ে নিয়ে হয়, আমদানি শুল্কের উপর ২০০ শতাংশ কর বসিয়ে, তিনটি নদীর জল পাক সীমান্তে আটকিয়ে ভারত সেই অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কাশ্মীরের ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নবাদী নেতাদের সরকারি সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া। অথচ এই দেশ বিরোধীদের পেছনে পূর্বতন ভারত সরকার গত দশ বছরে প্রায় ১১ কোটি টাকা খরচ করেছে। তাদের সরকারি গাড়ি, পেট্রল, সিকুরিটি, হোটেল খরচ ইত্যাদি এলাহি সুযোগ সুবিধা ছিল। তাই এইসব কালসাপদের এইরকম দুধ কলা দিয়ে পোষার আর কোনো মানে ছিল না। মোদী সরকার তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মোদী সরকারের ২০১৪ সালে নির্বাচনী ইস্তেহারে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) বিলুপ্তির প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু সেটা গত ৫ বছরে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে ধারা ৩৭০ সংবিধানের একটি অস্থায়ী অনুচ্ছেদ। নিয়মানুসারে অনুচ্ছেদটি ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই বিলুপ্ত হয়ে যায় যখন রাজ্য সরকার অনুচ্ছেদটি সংযোজনের জন্য অনুমোদন দেয়। তারপর ১৯৫৭ সালেও অনুচ্ছেদটি তুলে দেওয়া যেত যখন জম্মু কাশ্মীরের সংগঠনীয় পরিষদ ভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। অনুচ্ছেদ ৩৭০ আমাদের দেশের জন্য প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এটি সংবিধানের এক দেশ, এক আইন, এক জাতীয় সংগীত, এক জাতীয় পতাকার মর্যাদাকে আঘাত করে। দেশের কোনো বিশেষ রাজ্যের জন্য আলাদা পতাকা থাকবে, দেশের সর্বোচ্চ সুপ্রিম কোর্টের রায় সেখানে প্রতিফলিত হবে না, জাতীয় পতাকার কোনো সম্মান থাকবে না, আলাদা নাগরিকত্ব আইন থাকবে, সেখানকার জমি ক্রয় বিক্রয় করা যাবে না, জন্ম-মৃত্যু-বিয়েতে আলদা বিধি বিচার ইত্যাদি থাকতে পারে না।

ধারা ৩৭০ আমাদের দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই ২০১৯-এর ১৪ জানুয়ারি আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় সুপ্রিমকোর্টে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তির জন্য আবেদন জানান। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে বেঞ্চটি এপ্রিল মাসের ২ তারিখে শুনানির সিদ্ধান্ত নেয়। পুলওয়ামা কাণ্ডের আত্মঘাতী জঙ্গি ছিল কাশ্মীরের বাসিন্দা আদিল আহমেদ দার। এতো বিস্ফোরক পাকিস্তান থেকে উড়ে আসেনি। সম্পূর্ণ মদত জুগিয়েছিল এই ৩৭০ ধারার সুবিধাভোগীরা। তাই হাফিজ সাঈদ, মাসুদ আজহারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অভিশপ্ত ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি সর্বসম্মতিক্রমে ঘটিয়ে দেশদ্রোহীদের চরম জবাব দেওয়া হোক। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

কেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থীদের ভোট দেবেন না

সৃজিত রায়



তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা দেখে আপনি কি খুব উল্লসিত? তালিকায় তারকাদের প্রাধান্যে আপনি কি ভাবছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটা একটা মাস্টারস্ট্রোক? তাহলে আসুন, সবার আগে এই সব তারকাদের একটু যাচাই করে নেওয়া যাক কতকগুলি তথ্য এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় ছিলেন— দেব (দীপক অধিকারী), মুনমুন সেন (শ্রীমতী দেববর্মা), সন্ধ্যা রায়, শতাব্দী রায় এবং মঞ্চাভিনেত্রী অর্পিতা ঘোষ। চলুন দেখে নিই, সাংসদ হিসেবে সংসদের হিসাবে এঁদের ভূমিকা কেমন ছিল। পার্লামেন্টের হিসাব জানাচ্ছে ২০১৪ সালের নির্বাচনোত্তর সংসদের অধিবেশনে সাংসদ প্রতি গড় হাজিরা ছিল ৮০ শতাংশ। সাংসদ প্রতি বিতর্কে অংশগ্রহণের গড় হিসাব ৬৭.১ শতাংশ আর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে মাথাপিছু ২৯৩টি। এবার দেখা যাক, তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা সদস্যরা সংসদের অধিবেশনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। দেব হাজির ছিলেন মাত্র ১১ শতাংশ অধিবেশনে। বাকি সময়টা তিনি ব্যয় করেছেন তাঁর পেশা চলচ্চিত্রে অভিনয় এবং প্রযোজনার পিছনে। পাঁচ বছরের অধিবেশনে তিনি প্রশ্ন করেছেন সাকুল্যে তিনটি আর দুটি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। এই দেব এবারও প্রার্থী। সন্ধ্যা রায়। ৭৭ বছর বয়স। বেশিরভাগ সময় কাটত হাসপাতালেই। তিনি হাজির থেকেছেন ৫৩ শতাংশ অধিবেশনে। তিনটি বিতর্কে অংশ নিয়ে ২।৪ লাইন পাঠ করেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন? না, একটি প্রশ্নও উত্থাপন করেননি। এবার বাদ পড়েছেন।

রাজ্য রাজনীতি

মুনমুন সেন ওরফে শ্রীমতী দেববর্মা। গ্ল্যামারাস নায়িকা। যদিও বয়স ৬৪ পার। ৬৯ শতাংশ হাজিরা দিয়েছেন কিন্তু একটি প্রশ্ন করার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেননি। কোনওরকমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে একটা বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। এবার প্রার্থী। তবে বাঁকুড়ার বদলে আসানসোলে। ভোট পাবেন? শতাব্দী রায়। অনেকদিনের নায়িকা। ৭৪ শতাংশ অধিবেশনে হাজিরা দিয়েছেন বটে কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস দেখিয়েছেন মাত্র দুবার। বিতর্কে অংশ নিয়েছেন চারবার। হ্যাঁ, প্রার্থী এবারও। ভোট দেবেন? বরং কিছুটা সিরিয়াস গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রী অর্পিতা ঘোষ। ৬২ শতাংশ অধিবেশনে হাজিরা দিয়ে ২৬টি প্রশ্ন করেছেন, ২১টি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এবারও প্রার্থী। বালুরঘাটে স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বের রোষকষায়িত চক্ষুরাগের ভয় মাথায় নিয়েই।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পাচ্ছেন। বিজেপিকে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মোদীজীকে। ওই একটি মানুষকেই তিনি যমের মতো ভয় করেন। কারণ মানুষটা জানেন, কোন অসুখের ওষুধ কোনটা! দাবার বোর্ডে কোন চালটা চালতে হবে কখন। তৃণমূলের তারকারা যখন খসে পড়বেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঁচও পাবেন না।

এই হিসাব সহজেই প্রমাণ করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক সস্তার চমক ছাড়া কিছুই নয়। আসলে উনি ভুলে গেছেন, এবার ভোটে বাঙালি ভোট দেবে প্রার্থীকে আতস কাঁচে যাচাই করে। যেমন ধরুন— এবার যোগ হয়েছে আরও দুই তারকা। বসিরহাট কেন্দ্রে নুসরত জাহান যিনি রুপোলি পর্দায় তৃতীয় শ্রেণীর নায়িকা কিন্তু দিদির হিসাবে প্রথম শ্রেণীর প্রার্থী। কারণ তিনি মুসলমান। দুটো হিসাব এক্ষেত্রে আরও মেলানোর দরকার ছিল এবং সে হিসাব দিদি না মেলালেও বাঙ্গালি মেলাবে, কারণ এই

নুসরত জাহানের বয়ফ্রেন্ড কাদের ধর্ষণ করেছিল সুজেটকে, পার্কস্ট্রিটে চলন্ত গাড়িতে। যে ঘটনাটা দিদির কাছে ছিল 'ছোটো ঘটনা'। আর ওঁকে প্রার্থী করা হয়েছে গতবারের বিজয়ী প্রার্থী ইদ্রিশ আলিকে সরিয়ে। এই সেই ইদ্রিশ আলি যিনি নিজের স্বার্থে যে কোনো মানুষের গলায় কোপ মারতে দ্বিধা করেন না।

আর এক তারকা মিমি চক্রবর্তী। প্রথম আবির্ভাব (বাংলা সিরিয়াল গানের ওপারে)-এই ব্যর্থ নায়িকা। এখন চটুল নায়িকার শিরোপায় ভূষিত। ২১ জুলাই-এর মঞ্চে দাপাদাপি করে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের মন ভিজিয়েছেন। অতএব প্রার্থী। যাদবপুরে। যাদবপুরবাসী ভোট দেবেন? আপনারা সোমনাথ চ্যাটার্জিকে ভোট দিয়েছেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ভোট দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। সেই হাতে মিমিকে? লজ্জা করবে না? দেব ফের ঘাটালে। কেন ভোট দেবেন ঘাটালবাসী যিনি মাত্র ১১ শতাংশ অধিবেশনে হাজির ছিলেন? বাকি সময়টা কাটিয়েছেন শ্রীকান্ত মোহতার ল্যাজ ধরে? পাঁচ বছরে তিনটি প্রশ্ন। লজ্জায়? নাকি মুখ খললেই তোতলামি ধরা পড়ে যাবে বলে!

মুনমুন সেন। অভিনয়টা একেবারেই জানেন না। সুচিত্রা সেনের মেয়ে বলেই গ্ল্যামার। গতবার বাঁকুড়ায় জিতেছিলেন। এবার তাহলে আসন বদলালো কেন? নির্ঘাত হারবেন বলেই তো! এবার টক্কর বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে। আসানসোলে। মলয় ঘটক সঙ্গে থাকলে অন্তত টক্করটা দিতে পারবেন। নাহলে আমও যাবে, ছালাও যাবে।

বারাকপুরে এবার দীনেশ ত্রিবেদীর সর্বনাশ! অর্জুন সিংহ বিজেপিতে। শোনা যাচ্ছে, প্রার্থী তালিকার ঘোষণার দিন অর্জুন সিংহকে ঠারেঠোরে গালাগাল না দিলে নাকি তিনি দলত্যাগ করতেন না। দিদি নাকি ইচ্ছে করেই করেছেন যাতে বারাকপুরে দীনেশ হারেন। কারণ পুরনো রাগ। অথচ অন্যরাজ্যের তারকা সাংসদদের ভূমিকাটা মেলান। জয়াপ্রদা। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ছিলেন দীর্ঘদিন। ২০১৪-র পার্লামেন্টে ৩৯ শতাংশ হাজিরা দিয়েছেন। ২৭টি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। ৩৯৫টি প্রশ্ন করেছেন। জয়া বচ্চন ৭৮ শতাংশ হাজিরা। ১৬৮ বার বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। ৪৫১টি প্রশ্ন করেছেন। কম যান না হেমা মালিনীও। বিজেপির সাংসদ হিসেবে ৩৯ শতাংশ অধিবেশনে হাজিরা সত্ত্বেও ১৭টি বিতর্ক অংশ নিয়েছেন। ২১০টি প্রশ্ন করেছেন।

একমাত্র ব্যতিক্রম শত্রুঘ্ন সিনহা। বিজেপির সাংসদ। ৬৭ শতাংশ হাজিরা সত্ত্বেও একটা প্রশ্নও করেননি কখনও। একটা বিতর্কেও অংশ নেননি। যখন বুঝেছেন, বিজেপি এবার আর টিকিট দেবে না তখন দিদির দলে ভেড়ার আশায় ব্রিগেডের মঞ্চে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসে একটা হিল্লে হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্য শত্রুঘ্নর। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি।

নারদা মামলায় অভিযুক্তরাও যথারীতি আছেন। সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মায় অপরূপা পোদ্দারও। আছেন রোজভ্যালি মামলায় অভিযুক্ত সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রচারে তো তাদেরও বেরোতে হবে। ভিডিও দেখবে মানুষ। প্রশ্নও করবে। জবাব দিতে পারবেন তো?

বনগাঁর প্রার্থী মমতাবালা ঠাকুর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মতুয়া বংশের মূল ধারার কেউ নন। তাঁর জন্যই নাকি মতুয়া ভোট এবার চার ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তিন ভাগই নাকি বিজেপির পকেটে। তারওপর মমতাবালা পারিবারিক ঝামেলা এড়াতে ৭৩ শতাংশ অধিবেশনে হাজির থাকলেও সংসদে একটা প্রশ্নও করেননি কোনওদিন। বাকি প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে সব দলছুটের দল। পরেশ অধিকারী, কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মৌসম বেনজির নূর, মহুয়া মৈত্র। কেউ কংগ্রেস থেকে। কেউ ফরোওয়ার্ড ব্লক থেকে। এদের পিঠে তো 'বিশ্বাসঘাতক' স্ট্যাম্প পড়েই গেছে। মানুষ কেন ভোট দেবে বিশ্বাস করে? হ্যাঁ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে একটু হৈ চৈ হচ্ছে বটে। কিছু বাচনভঙ্গি, কিছুটা গ্ল্যামারের কারণে। রাহুল গান্ধীর প্রিয়পাত্রী ছিলেন বছর ৪৫-এর এই ছিপছিপে মহিলা। আম আদমি কা সিপাহির চাবুক বক্তা হিসেবে নাম কুড়িয়েছিলেন। বড়ো মাপের চাকরিও করতেন। আর্থিক কেতাও আছে। ঘোষিত সম্পত্তিই ২.৫ কোটি টাকা। শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন ওনার ব্যক্তিগত জীবনের অনেকটা অংশ। তা নিয়ে রয়েছে অনেক কানাঘুষো। তা থাক। দলছুট হয়ে বিধায়িকা হয়েছিলেন তৃণমূলের টিকিটে। এবার সাংসদ পদের প্রতিযোগী কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে। ঘাগু নেতারা সব অপেক্ষায় রয়েছে ল্যাং মারবেন বলে। তবে মহুয়া পাল্টা ল্যাং দিতেও অভ্যস্ত। দেখা যাক।

সত্যি বলতে কী, এবার প্রার্থী তালিকায় সৌগত রায় বা রত্না দে বা মমতাজ সংঘমিত্রার মতো দু-চারজনই রয়েছেন যাঁরা প্রমাণ করেছেন, সাংসদ হওয়ার যোগ্যতা তাঁদের আছে। আবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপাতত বাদ পড়েছেন দলের সভাপতি সুব্রত বক্সী নিজেই। হয়তো আরও লোভনীয় পদ পাবেন এই আশায় চুপচাপ। কিন্তু সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে একেবারে কলকাতা থেকে ঠেলে বার করে দেওয়া হলো কেন? তাও বাঁকুড়ায়! বেশ সন্দেহজনক। নিন্দুকরা বলাবলি করছেন, রাঢ় বাংলা এবার পুরোপুরি গেরুয়া। বাঁকুড়া তো রাঢ় বাংলারই অন্যতম। চরম চ্যালেঞ্জের মুখে বর্ষীয়ান নেতা, মমতাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। শিক্ষক হয়ে ছাত্রীর হাতের চাবুক খাবেন আর কতদিন। শেষ পর্যন্ত কি মেনে নিচ্ছেন সুব্রত? উনি বলছেন, মানুষ মেনে নিলেই হলো।

তা তো ঠিক। প্রশ্নটা সেখানেই। ২০১৯-এর বাংলা ২০১৪-র বাংলা নয়। রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাটাই পাল্টে গেছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেঁচাতে হচ্ছে। আর্তনাদ করছেন উনি। কারণ উনি ভয় পাচ্ছেন। বিজেপিকে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মোদীজীকে। ওই একটি মানুষকেই তিনি যমের মতো ভয় করেন। কারণ মানুষটা জানেন, কোন অসুখের ওষুধ কোনটা! দাবার বোর্ডে কোন চালটা চালতে হবে কখন। তৃণমূলের তারকারা যখন খসে পড়বেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঁচও পাবেন না। ■

কে হবে প্রধানমন্ত্রী!

ভোটের বাদ্যি বেজে গেছে। কোন দল ক্ষমতায় আসবে এবং কী অবস্থায় আসবে তা বর্তমান পরিস্থিতিতে আগাম বলা সত্যি কঠিন। তবে ছোটো আকারে বা বড়ো আকারের যে ভাবেই হোক জোটবন্ধন করতে হবে বলেই মনে হয়। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গদিতে কে বসবেন তা বলা কঠিন। এদের মধ্যে একজন দাবিদার যে রাহুল গান্ধী, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একটা কথা বলা যেতে পারে তিনি এই পদের জন্য বর্তমানে যোগ্য নন। 'চৌকিদার চোর হ্যায়।' এই বাক্যটি তিনি এখন পর্যন্ত অন্তত এক হাজারবার উচ্চারণ করেছেন, যা বলা যেতে পারে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের মুখের কথাই বাণী হয়ে যায়, যাকে কুবাণী বা সুবাণী যাই বলা হোক না কেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শিখ হত্যা যজ্ঞের পর বলেছিলেন, ''বড়ো গাছ পড়লে, মাটি কাঁপবেই। অনুরূপভাবে আমাদের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, 'ভারতের সম্পদের প্রথম দাবিদার, মুসলমানরা।' তাঁরা বাক্য দুটি একবার করেই বলেছিলেন, কিন্তু এখনও মুখে মুখে চর্চিত হয়ে আসছে। কাজেই বলা যেতে পারে, বর্তমান কংগ্রেস সভাপতির এই যে প্রলাপ মন্ত্র জপ করা, তার জন্য তাঁকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। নতুবা প্রধানমন্ত্রীর পদটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

—জহরলাল পাল,
লিঙ্করোড, শিলচর, অসম।

মমতার তালজ্ঞান

১৯ মার্চ, মঙ্গলবার মারোয়াড়ি সমাজের এক অনুষ্ঠানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতাদেবী নিজে অনেক বড়ো ধার্মিক বোঝাতে তার সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিতশাহকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছেন, তার সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সমাজের সন্ন্যাসী, সাধু, সন্ত যাঁরা কপালে তিলক কাটেন তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। হিন্দু ধর্মের মানুষদের ধার্মিক হওয়ার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজার্চনা করতে হবে বা কপালে তিলক কাটতে হবে এটা তিনি কোথায় পেলেন? আসলে ধর্ম জিনিসটা কী সেটাই মনে হয় মমতাদেবী সঠিক জানেন না বা মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এক মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে এটা একটা 'Way of life' অর্থাৎ জীবন যাপনের একটা পদ্ধতি। ব্যক্তিগত জীবন হতে সর্বোচ্চক্ষেত্র পর্যন্ত ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠ পথই হিন্দুধর্ম।

ধৃতিঃ ক্ষমা দামোহস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্ম-লক্ষণম্।।

—ধৈর্য, ক্ষমা, দম (সংযম), অস্তেয় (চুরি না করা), পরিচ্ছন্নতা, ইন্দ্রিয় সংযম, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি গুণ ধর্মের লক্ষণ। শ্রেষ্ঠ গুণগুলোকে হিন্দু দর্শনের সর্বত্র ধর্মপথ বলা হয়েছে। তবে তা নিঃশর্ত নয়। অহিংসা হলো আমি লোভ, ঈর্ষা, জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে কাউকে দৈহিক বা মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত করবো না, কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবো না, কারো জীবন-সংশয় ঘটাবো না।

তবে কেউ আমার ধনসম্পদ কেড়ে নিতে এলে, আমার বিশ্বাসকে লাঞ্ছিত করলে বা স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইলে, আমার দেশের সার্বভৌমত্বে ও ধর্মে আঘাত করলে, কোনো নারীকে বলাৎকার করতে উদ্যত হলে তা সহ্য করা অহিংসা বা ধর্ম নয়। তার প্রতিরোধ, প্রতিকার হলো ধর্ম। মমতাদেবী, বর্তমানে রামমন্দির বিজেপির কোনো নির্বাচনী ইস্যু নয়। নির্বাচন এলে বিজেপি রামমন্দিরের জিগির তোলে না। বরঞ্চ উল্টো, রামমন্দির ইস্যু সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন, বিজেপি রামমন্দিরের ফয়সালা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে উন্নয়নের ইস্যুকেই নির্বাচনে হাতিয়ার করেছে।

—সঞ্জয় মুখার্জী,
শিবপুর, হাওড়া-২।



অহিংসা ও বহুত্বের দেশে আজও হিংসার রক্ত ঝরছে কেন?

প্রশ্নটি খুবই হৃদয় বিদারক ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ পরিমাপের বিতর্ক গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ৭০ বছরে জঙ্গিহানায় ৮০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় সেনার বলিদান নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করে না। মনে প্রশ্ন জাগে বহুত্বের মিলন কি খণ্ডতায় না অখণ্ডতায়! যদি অখণ্ডতায় হয়, তবে নেতাজী সুভাষের দর্শনই ছিল অহিংসার দর্শন। জহরলাল নেহরুর ভগ্নভারতের এ কী পরিণতি? কাশ্মীরিগণের কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনের নির্যাতন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নির্যাতন, অধুনা বাংলাদেশের জন্ম দিতে বহু ক্ষয় ও সৈন্য ক্ষয় বৃথা গেল।

ভারতে এই হিংসার রক্তক্ষয় বন্ধ হবে কি? তবে বর্তমান মোদী সরকারের বৈদেশিক কূটনৈতিক তৎপরতায় বিশ্বের প্রায় সকল দেশই জঙ্গি হিংসার পথ যে মানবতার পরিপন্থী এটা বুঝতে পেরেছে। এ সাফল্যের ফলেই ওয়াঘা সীমান্তে বীরের মর্যাদায় অভিনন্দনকে 'ভারতমাতা কি জয়' স্লোগানে অভিনন্দিত করা গেল। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর বিদেশ ভ্রমণের অর্থ ব্যয় যে বৃথা যায়নি এটাও বোঝা গেল না।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিভাঙ্গা,
কোচবিহার।

কাশ্মীরের মুসলমানরা কি সত্যিই ভারতীয় ?

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্প্রতি পুলওয়ামার ঘটনার পর দেশব্যাপী রাজনৈতিক দল, নেতা ও সাধারণ মানুষ নানা প্রকার মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়ের একটি বক্তব্য নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্কের ঝড় উঠেছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল মহোদয় কাশ্মীরিদের বয়কটের ডাক দিয়েছেন এবং তাঁর এই বক্তব্যের জন্য বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা ও পাকপন্থী সেকুলারিস্টরা রাজ্যপালের পদ থেকে তাঁর অপসারণের দাবি তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান ('কলম' পত্রিকা খ্যাত) তাঁর সম্পাদিত 'পুবের কলম' পত্রিকায় গত ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সম্পাদকীয়র কলামে প্রধানমন্ত্রীকে শ্রী রায়ের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কিছু বিষয়ের অবতারণা বড়োই প্রয়োজন।

১৯৪৭-এ দেশভাগ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অল্পদিন পরেই পাকিস্তান হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য হামলা করে। একমাত্র কারণ— তখনও রাজা হরি সিংহের সৈন্যদের ওপর আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে হাত মেলায়। কাশ্মীরের রাজার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ সিংহকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর তার মৃতদেহ লাইটপোস্টের মাথায় ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে, ভারতীয় আর্মির পাল্টা মারে কাশ্মীরের অর্ধেক ভারতে এলেও প্রথম থেকেই তার প্রতি বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়ে। তার একটি হলো ৩৭০ ধারা, যার পাপ সমগ্র ভারতবর্ষ আজও নিজের রক্ত দিয়ে শোধ করে চলেছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নিঃসন্দেহে, কিন্তু কাশ্মীরি মুসলমানরা আদৌ ভারতীয় কিনা বা তারা ভারতীয় সভ্যতার অংশ কোনোদিন হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে কিনা— সেটি বিচার করার দিন এসেছে।

যদি কোনো কাশ্মীরি মুসলমান ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বা পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন এবং নিহত হন তাঁদের নামাজ-ই-জানাজায় পরিবারের মানুষ ব্যতিরেকে আর কেউ যোগ দেন না। এই প্রথাটি কাশ্মীরি উপত্যকায় বহুকাল ধরেই চলে আসছে। যদি কেউ যোগ দেন তাঁরা অত্যন্ত ভীত থাকেন নিরাপত্তার কারণে। পক্ষান্তরে কোনো উগ্রপন্থী বা জঙ্গি নিহত হলে তার নামাজ-ই-জানাজায় হাজার হাজার পাকপন্থী মুসলমান সমবেত হয়। এই প্রসঙ্গে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়। ১৯৮৪ সালে জেকেএল এফ-র প্রতিষ্ঠাতা মকবুল ভাটের ফাঁসি হয় তিহার জেলে। জেল চত্বরে তাকে কবর দেওয়া হয় পূর্ণবিধি অনুসারে। কিন্তু তার দেহ তিহার জেল থেকে কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে দুটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় কাশ্মীরের উপত্যকায়। হিজবুল মুজাহিদিনের কুখ্যাত নেতা তথা ভয়ংকর জঙ্গি সাইফল নিহত হয় এপ্রিল ৪,২০০৩। এই কুখ্যাত জঙ্গির নামাজ-ই-জানাজায় এবং কবর দেওয়ার সময় (পূর্ণ বিধি অনুসারে) ২৫ হাজারেরও বেশি পাকপন্থী মুসলমানরা সমবেত হয়। শোকে আচ্ছন্ন বহু বৃদ্ধা মহিলা এবং শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে মৃতদেহটি প্রদক্ষিণ করে এবং আজাদির জন্য বারংবার ধ্বনি দিতে থাকে। হিজবুল নেতা বুরহান ওয়ানির নামাজ-ই- জানাজায় দুই লক্ষেরও বেশি পাকপন্থী মুসলমান সমবেত হয়।

১৯৪১-র সেন্সাসে শ্রীনগর উপত্যকায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল ১৫ শতাংশ। ১৯৮১ সালের সেন্সাসে তা কমে দাঁড়ার মাত্র ৫ শতাংশে। ১৯৯০ সালে সংখ্যালঘু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়নের জন্য সমগ্র উপত্যকায় ঘটে এক ভয়াবহ ও নারকীয় অত্যাচার। গণহত্যা, গণধর্ষণ, গৃহদাহ, মন্দির লুণ্ঠন, ধ্বংস। ঝিলম নদীতে বিগ্রহ ভেঙে নিক্ষেপ করা হয়। ফলত এক রাতের মধ্যেই নিঃস্ব হয়ে যাওয়া তিন লক্ষ বিধ্বস্ত, লাঞ্ছিত ও ভয়ংকরতমভাবে নিপীড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতরা আশ্রয় নেন দিল্লিতে। এটি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো আদর্শনিষ্ঠ, ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা একটিও কথা বলেননি। অথচ ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলে কাশ্মীরে উৎসব পালিত হয় ও ঠিক তার আগের বছর কাশ্মীরে ইন্দিরার একটি জনসভায় প্রথম সারিতে বসে থাকা কাশ্মীরি মুসলমানেরা প্রকাশ্যে নিজেদের লিঙ্গ প্রদর্শন করে।

তাছাড়া সেনাদের প্রতি পাথর ছোঁড়া তো তাদের অধিকারের মধ্যে পড়েছে। তাই আবার প্রশ্ন করছি, কাগজে কলমে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও কাশ্মীরি মুসলমানরা কি সত্যিই ভারতীয় না মনেপ্রাণে পাকপন্থী? অথচ তাদের পূর্বপুরুষরা সকলেই ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত। শেখ আব্দুল্লার ঠাকুরদা ছিলেন রঘুরাম কাউল। এখানে আর একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে পোষণ করি— ভারতে কি আদৌ কোনো জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন? সর্দার প্যাটেলের মতে (সেই যুগে) একজনই জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন আর তার নাম জওহরলাল নেহরু।

একান্তভাবেই আমার মনে হয়, ভারতে বসবাসকারী কোনো মুসলমানই চায় না পাকিস্তান দুর্বল হোক বা ভারতীয় সেনার হাতে পর্যদুস্ত হোক। কারণ তারা এদেশের মুসলমানরা পাকিস্তানকেই তাদের আশা-ভরসার শেষস্থল মনে করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে এ বঙ্গের সমস্ত মুসলমান দল-মত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে তৎকালীন কলকাতাস্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে 'আছেছলাম ওয়ালেকুম' বলে সম্বোধন করে তাদের পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে। পরে বিতর্ক এই পর্যায়ে পৌঁছয় যে তা ধস্তাধস্তিতে পরিণত হয়।

ভারতীয় মুসলমানরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কণামাত্রও সাহায্য করেননি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনার নিকট ৯৩ হাজার পাকসেনা আত্মসমর্পণ করলে তারা মুহ্যমান হয়, বুক চাপড়াতেও থাকে। বলে, 'হে আল্লা তুমি এ কী করলে?' কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে ইসলামি জেহাদিরা অপরাজেয়।

মহিলাদের বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি অপরাধ পশ্চিমবঙ্গে

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন পশ্চিমবঙ্গ এবং এখানকার মানুষদের একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন। কেবলমাত্র আধুনিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা দেখতে পাই বাঙ্গালিদের গৌরবময় অতীতের কথা। সমগ্র ভারতের কাছে শিক্ষিত, কৃষ্টি- সংস্কৃতি মনস্ক একটি সমাজরূপে বিশেষভাগে সমাদৃত বাঙ্গালিরা। এখানে সবাই স্বাধীনচেতা, মেয়েরা লেখাপড়া এবং কেরিয়ারে বিশেষ ভাবে অগ্রণী, বাঙ্গালি বলতে এমন একটি ধারণা ভারতে আছে। অথচ বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা সবথেকে বেশি হয়ে আসছে। মহিলাদের প্রতি অত্যাচার, শোষণ, পণের জন্য প্রতারিত করা, দুষ্কর্ম, অপহরণ এমনকী মহিলাদের কেনা-বেচার মতো ঘটনা অনেক বেশি হচ্ছে। এনসিআরবি (ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো) এবং এসসিআরবি (স্টেট ক্রাইম ব্যুরো)-র রিপোর্ট অনুসারে গত দশ বছরে মহিলাদের প্রতি বিভিন্ন অপরাধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে ইভটিজিং করা, পণের জন্য প্রতারণা বধূহত্যা এবং শ্বশুরবাড়ি কর্তৃক নব-বিবাহিতাকে অত্যাচার করার কয়েক হাজার ঘটনা থানাতে দায়ের করা হয়েছে। হিসাবমতো রাজনৈতিক হত্যার মামলায় এর স্থান ১৯, কিন্তু মহিলাদের প্রতি হওয়া অপরাধে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বপ্রথম। স্টেট ক্রাইম ব্যুরো ২০১৭-২০১৮-এর অপরাধের হিসাব থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করছে না।

ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে ২০১১-তে দুষ্কর্মের ২৩৬৩টি এবং ২০১২-তে দুষ্কর্মের ২০৪৬টি মামলা দায়ের করানো হয়েছিল। ২০১১-তে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ২৯১৩৩টি এবং ২০১২-তে ৩০৯৪২টি মামলা দায়ের করা হয়। সমগ্র ভারতে মহিলাদের ওপর যত অত্যাচার হয়েছিল, তার ৪১ শতাংশ হয়েছিল আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে।



মহিলাদের প্রতি অত্যাচার এব অপরাধের ঘটনা এইভাবে বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। এরপর ২০১৪-তে দুষ্কর্মের ১৪৬৬টি এবং ২০১৫-তে ১১৯৯টি ঘটনা ঘটে। এই দুই বছরে ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটে ১৪,৯১৬টি। মহিলা চুরির মতো ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই সর্বাধিক।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলি আমাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক অথচ কঠোর সত্য। আমরা নানান ক্ষেত্রে বিস্তৃত চিন্তাভাবনা এবং উদার মনোভাবের পরিচয় দিলেও মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড়োই নিষ্ঠুর। একটি পরিবারে নবজাত কন্যাসন্তান কেবলমাত্র 'মেয়ে' হিসাবেই পরিগণিত হয়। সেখান থেকে 'মানুষ' হয়ে ওঠার জন্য তাকে অনেক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মেয়েদের প্রতি হওয়া অত্যাচারের মূল কারণ তাকে 'দুর্বল' করে দেওয়া। এই যুগেও খুব কম অভিভাবক একজন পুত্রসন্তানের মতো সমান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কন্যাসন্তানকে বড়ো করে তোলেন। একজন 'দুর্বল' সবসময় অত্যাচারিত হতে থাকে। সেই অত্যাচার নানারূপে হয়ে থাকে। সবসময় মারধোর করা বা খেতে না দেওয়া নয়। অনেক মেয়েকে চূড়ান্ত মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়— বিয়ের আগে অভিভাবকদের এবং বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ির। মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলে তাদের অবশ্যই স্বনির্ভর হবার সুযোগ দিতে হবে। আর্থিক স্বনির্ভরতা একজন মানুষকে অনেকটাই স্বাধীনচেতা করে তোলে, সে তখন নিজেই দুর্বলতাকে জয় করে। এমন একজন মানুষকে অত্যাচার করা, শোষণ করা অত সহজ নয়।

দুর্ভাগ্যবশত বিয়ের পরে যেসব মেয়ে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের শিকার হয়, তারা অনেকেই বাপের বাড়ির লোকেদের জানাতে দ্বিধা করে। এত অর্থ ব্যয় করে বিয়ের পরে, আবার সেই বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়া তারা মানসিক ভাবে চায় না। লোভী, অসৎ ওই শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও তা বোঝে। সেজন্য যতক্ষণ না তাদের চাহিদা মিটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারের সীমা আরও বাড়াতে থাকে। পরিণতিতে অনেক সময় মেয়েরা নিজেরাই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, নতুবা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়। এই সত্য কি আমরা অস্বীকার করতে পারি?

আমাদের সমাজে একটি মেয়ে বড়ো হয় এই জেনে যে, এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি, একদিন তার বিয়ে হবে এবং শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে কিছু হলেই অনেক স্বামী মন্তব্য করে বসে 'আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।' দুর্বল মেয়েটি ভাবতে বসে, বেরিয়ে সে যাবে কোথায়? আগে ছিল 'বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়িতেও অনিশ্চয়তা, তাহলে? একজন স্বনির্ভরশীল মেয়ে আর দুর্বল থাকে না, তার নিজস্ব বাসস্থান থাকতেই পারে। সে তখন ভাবতে বসবে না যে সে কোথায় যাবে। সেক্ষেত্রে, তাকে কেউ অন্যায় কিছু বলার সাহস পাবে না। মেয়েটি দুর্বল থাকবে না। ■



কিডনিতে পাথর কীভাবে বুঝবেন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

আমাদের দেশে কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সংখ্যাটি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে কিডনি স্টোন বা বৃক্কে পাথর জমার সমস্যার কথা এখন প্রায়শই শোনা যায়। কিডনির সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো স্টোন বা পাথর হওয়ার সমস্যা । কিডনি স্টোনের প্রাথমিক লক্ষণ নির্ভর করে স্টোন কিডনির কোথায় এবং কীভাবে রয়েছে। কিডনিতে স্টোনের আকার-আকৃতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাথর খুব ছোট হলে সেটি কোনো ব্যথা-বেদনা ছাড়াই দীর্ঘদিন পর্যন্ত শরীরে থাকতে পারে। ফলে টেরও পাওয়া যায় না।

কিডনিতে পাথর জমার কারণ :

কিডনিতে পাথর জমার বা তৈরি হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে কিছু কিছু বিষয় কিডনিতে পাথর তৈরির কারণ বলে বিবেচিত হয়। যেমন—

- বারবার কিডনিতে ইনফেকশন হওয়া এবং এর জন্য যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা।
- শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য।
- অত্যাধিক পরিমাণে দুধ, পনির বা দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস।

কিডনিতে পাথরের উপসর্গ :

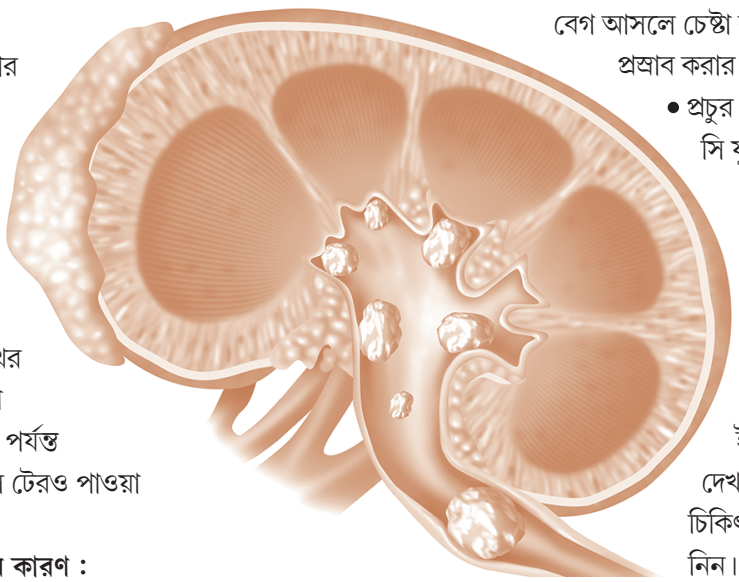
- রক্তবর্ণের প্রস্রাব।
- বমি বমি ভাব। অনেক সময় বমিও হতে পারে।
- কিডনির অবস্থান (কোমরের পেছন দিকে) ব্যথা। এই ব্যথা তীব্র তবে সাধারণত খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্যথা কিডনির অবস্থান থেকে তলপেটেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

চিকিৎসা :

কিডনির অবস্থানে ব্যথা এবং রক্তবর্ণের প্রস্রাব হলে চিকিৎসকরা সাধারণত দুটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন। একটি হলো কিডনির ইনফেকশন, অন্যটি কিডনিতে পাথর। তাই কিডনির এক্সরে, আলট্রা সনোগ্রাম এবং প্রস্রাবের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কখনো পর্যাপ্ত পরিমণে জল আর যথাযথ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সতর্কতা :

- কিডনি স্টোনের ঝুঁকি এড়াতে হলে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে।
- কখনো প্রস্রাব আটকে বা চেপে রাখবেন না! প্রস্রাবের বেগ আসলে চেষ্টা করবেন সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব করার।
- প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খান।
- দুধ, পনির বা দুগ্ধজাত খাবার অতিরিক্ত মাত্রায় না খাওয়াই ভালো।
- বারবার ইউরিন ইনফেকশন দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ■



সারা রাজ্যে বিজেপিকে নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে

পরিবর্তনের জোরালো সম্ভাবনা দেখা দিলে মানুষের আগ্রহ এইরকমই আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপিকে নিয়ে আগ্রহ তো বাড়ছেই। বাড়তি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে বিজেপির প্রার্থীপদ নিয়েও। বহু বিশিষ্ট মানুষ বিজেপির প্রার্থী হতে চান। তারা যে সবাই রাজনীতির জগতের মানুষ তা নয়। লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ চাকুরে, গৃহবধূ—এরকম বহু বিচিত্র পেশা এবং সামাজিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধি তারা। কিন্তু লক্ষ্য একটাই— বিয়াল্লিশ বছরের কুশাসনের অবসান। তাদের স্লোগান : পশ্চিমবঙ্গে চাই প্রকৃত পরিবর্তন। কিন্তু বিজেপি এতজন মানুষকে কীভাবে প্রার্থী করতে পারে? দলে পুরনো কর্মীরা রয়েছেন, নেতারা রয়েছেন। তাদের প্রার্থী হওয়ার দাবি কি উপেক্ষা করা যায়? বরং সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে তাদের দাবিই তো সর্বাগ্রে পূরণ করা উচিত। কোনটা উচিত আর কোনটা নয় এসবের মীমাংসা করতে গিয়ে বিজেপির কেন্দ্র এবং রাজ্য নেতৃত্ব পাহাড়প্রমাণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। কোথাও কোথাও ঘটে গেছে দু-একটা অপ্রীতিকর ঘটনা। কিন্তু এসবই ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে মানুষের আকাশছোঁয়া আগ্রহের ফসল।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার	—	নিশীথ প্রামাণিক	কলকাতা দক্ষিণ	—	চন্দ্রকুমার বোস
আলিপুরদুয়ার (তপশিলি)	—	জন বারলা	কলকাতা উত্তর	—	রাহুল সিনহা
জলপাইগুড়ি (তপশিলি)	—	ড. জয়ন্ত রায়	শ্রীরামপুর	—	দেবজিৎ সরকার
রায়গঞ্জ	—	দেবশ্রী চৌধুরী	হুগলি	—	লকেট চ্যাটার্জি
বালুরঘাট	—	ড. সুকান্ত মজুমদার	আরামবাগ (তপশিলি)	—	তপন রায়
মালদহ (উত্তর)	—	খগেন মুর্মু	তমলুক	—	সিদ্ধার্থ নস্কর
মালদহ (দক্ষিণ)	—	শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী	ঘাটাল	—	ভারতী ঘোষ
কৃষ্ণনগর	—	কল্যাণ চৌবে	ঝাড়গ্রাম (তপশিলি)	—	ড. কুনার হেমব্রম
বারাকপুর	—	অর্জুন সিংহ	মেদিনীপুর	—	দিলীপ ঘোষ
দমদম	—	শমীক ভট্টাচার্য	বিষ্ণুপুর (তপশিলি)	—	সৌমিত্র খাঁ
বারাসাত	—	ড. মৃণাল কান্তি দেবনাথ	বর্ধমান পূর্ব (তপশিলি)	—	পরেশচন্দ্র দাস
বসিরহাট	—	সায়ন্তন বসু	আসানসোল	—	বাবুল সুপ্রিয়
জয়নগর (তপশিলি)	—	ড. অশোক কাণ্ডারি	বীরভূম	—	দুধকুমার মণ্ডল
মথুরাপুর (তপশিলি)	—	শ্যামাপ্রসাদ হালদার	জঙ্গিপুর	—	মাফুজা হোসেন
যাদবপুর	—	অধ্যাপক অনুপম হাজরা	দার্জিলিং	—	রাজু বিস্ত





মমতার কাছে এবারের নির্বাচন ষোলোর থেকে কঠিন

চন্দ্রভানু ঘোষাল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে স্বীকার না করলেও একটা কথা নিশ্চয়ই মানেন, ২০১১ সালে তিনি নেতিবাচক ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। সিপিএমের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা শুধু সিপিএমকে ভোট দেবে না বলেই দিয়েছিল তৃণমূলকে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল সে সময়। তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে জোট প্রার্থীদের জয়জয়কারের পিছনে ছিল কংগ্রেস আর দক্ষিণে বামবিরোধী নেতিবাচক ভোট। ২০১৬ সালের নির্বাচনে সমীকরণ ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। সেবার কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হয়নি, হয়েছিল সিপিএমের সঙ্গে। ফলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। দক্ষিণের ফলাফলে মুখরক্ষা হয়।

এবারের নির্বাচনেও তৃণমূল একা লড়ছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর, কংগ্রেস এবং সিপিএমের মধ্যেও কোনও জোট হচ্ছে না। অর্থাৎ দুটি দল আলাদা লড়বে। এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে লড়াই হবে চতুর্মুখী। বিজেপি চতুর্থ পক্ষ। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত দীর্ঘ পরিসরে বিজেপি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং অমিত শাহের কুশলী পরিকল্পনায় আগামী নির্বাচনেও বিজেপির ভালো ফল করার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। প্রশ্ন হলো সেই ভালো ফল ঠিক কীরকম? এবারও কি বিজেপি স্থানীয় ভিত্তিতে ভোট শতাংশ বাড়িয়ে দু-একটা আসন জিতে নির্বাচনী দৌড় শেষ করবে? নাকি, অমিত শাহ যেমনটি দাবি করেছেন, ২৩টি আসনে জিতে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে অনেকখানি এগিয়ে যাবে?

কোনও কোনও ভোট বিশেষজ্ঞ মনে করছেন রাজ্যে কংগ্রেস এবং সিপিএমের জোট না হওয়ায় দুই দলের কমিটেড ভোটাররা যে-যার পছন্দের দলকেই ভোট দেবেন। ভোট ভাগাভাগি হবে না। তাতে লাভ তৃণমূলের। জোট হলে কমিটেড ভোটাররা অনেকেই বিজেপিকে ভোট দিতেন। সেক্ষেত্রে বিপদে পড়ত তৃণমূল। এই ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নিশ্চয়ই বলা যাবে না। কারণ এই ধরনের ঘটনা আমরা ২০১৬ সালে ঘটতে দেখেছি। সেবার দুই জাতশত্রু সিপিএম এবং কংগ্রেস তৃণমূলকে হারাতে জোট গঠন করেছিল। এই অনৈতিক জোটগঠনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন দুই দলের কমিটেড ভোটাররা। লাভ হয়েছিল তৃণমূলের। ২০১১ সালের পর আরও একবার, মূলত সিপিএম-কংগ্রেসের কমিটেড ভোটারদের নেতিবাচক ভোটের কল্যাণে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছিল তারা। দক্ষিণবঙ্গে নেতিবাচক ভোট পড়েছিল সব থেকে বেশি। বেঁচে গিয়েছিল তৃণমূল। নয়তো পাঁচ বছর শাসন করেই তাদের পাততাড়ি গোটাতে হতো।

এবারে কমিটেড ভোট অন্য কোনও বাক্সে পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অন্য একটি সম্ভাবনা আছে— যার কথা বিশেষজ্ঞরা কায়দা করে এড়িয়ে গেছেন। সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট হলে মুসলমান ভোট তিন ভাগে ভাগ হতো, এখন হবে চার ভাগে। এ রাজ্যের মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দিতেন না। কিন্তু কংগ্রেস এবং সিপিএমের দলগত অস্তিত্ব তলানিতে এসে ঠেকাতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই জায়গা করে নিয়েছে বিজেপি। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া একটি মুসলমান প্রধান কেন্দ্র। ২০১৬ সালে এখানকার মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। এবারও যে বিজেপি এখানে ভালো ভোট পাবে সেটা এলাকায় ঘুরলেই বোঝা যায়। মোদী সরকার তিন তালাক বিরোধী বিল আনার পর শিক্ষিত মুসলমান মহিলাদের বিজেপি সম্বন্ধে আগ্রহ বেড়েছে।

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরি। মুসলমান ভোট যত বেশি ভাগাভাগি হবে তৃণমূলের বিপদ তত বাড়বে। বিশেষ করে তৃণমূলের দুর্গ হিসেবে পরিচিত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এর প্রভাব পড়বে সব থেকে বেশি। সেই সুযোগে বিজেপি যদি কয়েকটি আসন জিতে নিতে পারে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। তেমন দুটি আসন হলো বসিরহাট এবং বনগাঁ। কয়েকবছর আগে বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য বসিরহাট থেকে জিতেছিলেন। মুসলমানরা ভোট না দিলে এই জয়লাভ সম্ভব ছিল না। এবার বসিরহাটে ভোটের সমীকরণ তুলনামূলকভাবে জটিল। তৃণমূল গতবারের বিজয়ী প্রার্থী ইদ্রিশ আলিকে টিকিট দেয়নি। প্রার্থী করেছে নুসরত জাহানকে। নুসরত সিনেমার অভিনেত্রী। রাজনীতিতে নতুন মুখ। তরুণ ভোটারদের একাংশ নুসরতকে দেখে

আহ্লাদিত হবেন। কিন্তু চল্লিশোর্ধ্ব হিন্দু ভোটারদের তিনি কতটা প্রভাবিত করতে পারবেন, সে সন্দেহ থেকেই যায়। সন্দেহ থেকে যায় ইদ্রিশ আলিকে নিয়েও। তিনি গতবারের বিজয়ী প্রার্থী। অথচ এবার টিকিট পাননি। তৃণমূলের অন্দরের খবর, দলের এই সিদ্ধান্তে ইদ্রিশ বেজায় চটেছেন। সুতরাং তিনি যদি অলক্ষ্যে থেকে নুসরতের পথে কাঁটা বিছিয়ে দেন তাহলে মুশকিলে পড়বে তৃণমূল। বিপুল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূলের নেতারাও চিন্তিত ইদ্রিশকে নিয়ে। কেউ কেউ তো ইদ্রিশের সঙ্গে তার পুরনো দল সিপিএমের লিংকও খুঁজে পেয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিচার করে বলা যায়, তাঁর স্বপ্ন পূরণ হবার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। উল্টে, তৃণমূল গতবার যত আসন পেয়েছিল এবার তার থেকে কম পাওয়ার সম্ভাবনা দিন-দিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। সম্প্রতি টাইমস-নাও চ্যানেলের প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষাতেও একই পূর্বাভাস মিলেছে। সমীক্ষার রিপোর্ট : তৃণমূল পরে ৩১টি আসন, বিজেপি ১১টি। বাম এবং কংগ্রেসের ঝুলি থাকবে শূন্য। এই ধরনের সমীক্ষার সঙ্গে বাস্তবের মিল সবসময় থাকে না। কিন্তু এই সত্যকে অস্বীকার না করেও বলা যেতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোটেও স্বস্তিতে নেই। তিনি জানেন সাধারণ বাঙ্গালিদের মধ্যে মমতা-বিরোধী মনোভাব বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। উন্নয়নের নামে প্রতারণা, পিসি-ভাইপোর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, অবাধ মুসলমান তোষণ, চুরি, দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ— এসব বাঙ্গালি, বিশেষ করে হিন্দু বাঙ্গালি আর ভালো চোখে দেখছে না। 'সব কাজ করা হয়ে গেছে'— বলে তিনি যতই প্রলাপ বকুন, শিক্ষিত বাঙ্গালি তরুণ জানে এ পোড়া পশ্চিমবঙ্গে তাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। হয় দালালি নয় তো পার্টির হয়ে গুন্ডামি— এই দুটো রাস্তাই এখন খোলা।

এমন এক আগ্নেয় পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মুকুল রায়ের অভাব। এর আগে ২০১৬ সালে তৃণমূলের ছেঁড়া-ফাটা শাড়িতে রিফুকর্মের প্রধান কারিগর ছিলেন মুকুল। দলের দক্ষিণবঙ্গের দুর্গ অক্ষত রেখেছিলেন। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে ধস নামতে দেননি। কিন্তু এবার তিনি বিজেপিতে। মুকুলের ক্ষুরধার রাজনৈতিক মস্তিষ্কের সুফল পাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূলকে ভাঙার কাজে তিনি যথেষ্টই সফল। অর্জুন সিংহ, সৌমিত্র খাঁ, অনুপম হাজরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে সব থেকে ওজনদার নাম অর্জুন সিংহ। হ্যাঁ একথা ঠিক, অর্জুন সিংহ আসায় কাঁকিনাড়া-ভাটপাড়া অঞ্চলের পুরনো বিজেপি কর্মীরা খুশি নন। কিন্তু তাদের একটা কথা বুঝতে হবে, এই নির্বাচনকে আমরা মুখে যতই সাধারণ নির্বাচন বলি না কেন, আসলে এই নির্বাচন সর্বস্ব পণ করার নির্বাচন। আদর্শ-অনাদর্শ, সত্যি-মিথ্যে, পাওয়া-না-পাওয়া লাভক্ষতি সব ভুলে শুধু দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্বাচন। কারণ এনডিএ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে না ফিরতে পারে তাহলে দেশ বিপন্ন হবে। দেশের মানুষ এক চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবেন। সব থেকে বড়ো কথা দেশ না থাকলে আমরা কেউ থাকব না। আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ-আনন্দ কিছুই থাকবে না।

সুতরাং বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই এখন একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সৌভাগ্যক্রমে বিজেপি শক্তিশালী হয়ে উঠছেও। অন্তত তিনটি আসনে বিজেপি জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে। দার্জিলিং আসানসোল এবং বারাকপুর। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ উত্তরে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা প্রবল। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর পূর্বের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোঝা গিয়েছিল জঙ্গলমহল গা থেকে সবুজ রং মুছে অনেকটাই গেরুয়া হয়ে উঠেছে। পুরুলিয়ায় আশাতিরিক্ত ভালো ফল করেছিল বিজেপি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম এবং পুরুলিয়ায় বিজেপি ভালো ফল করবে। তৃণমূল নেত্রী প্রায়ই বলেন জঙ্গল মহল হাসছে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর কিছু কাজ তিনি করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। বরং প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় সুফল পেয়েছে জঙ্গলমহল। নতুন রাস্তা তৈরি হওয়ার ফলে প্রত্যন্ত গ্রামগুলি এখন নাগালের মধ্যে এসেছে। যার ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি পেয়েছেন অনেকে। মিলেছে উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্পে রান্নার গ্যাসের সংযোগ। সব থেকে বড়ো কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার ধাপ্পাটি ধরা পড়ে গেছে। এখানকার মানুষ এখন জানেন এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ত্যোদয় প্রকল্পের একটি কর্মসূচি।

২০১৬ সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুরুপের তাস ছিল জনজাতি এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক। জনজাতি ভোটব্যাঙ্কে আগেই ভাঙন ধরেছিল, মুসলমান ভোটব্যাঙ্কও বড়োসড়ো ধসের সম্মুখীন। মুকুল-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ত্বহা সিদ্দিকি প্রায়শই মমতার সমালোচনা করছেন। এমনকী মুসলমানদের জন্য মমতা কী করেছেন তার কৈফিয়তও দাবি করেছেন তিনি।

এখন মমতা বুঝতে পারছেন তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। বাঘও বুঝে গেছে সওয়ারিটির সঙ্গে তার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। সে সওয়ারিকে ফেলে দেওয়ার অপেক্ষায়। আর মমতা ভাবছেন সত্যিই যদি ফেলে দেয় তাহলে তিনি কী করবেন!

এই গল্পের শেষাংশ জানা যাবে ২৩ মে। তার আগে বাঙ্গালি প্রস্তুত হবে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের পরিবর্তন আনার জন্য।



এখন মমতা বুঝতে পারছেন তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। বাঘও বুঝে গেছে সওয়ারিটির সঙ্গে তার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। সে সওয়ারিকে ফেলে দেওয়ার অপেক্ষায়। আর মমতা ভাবছেন সত্যিই যদি ফেলে দেয় তাহলে তিনি কী করবেন!

তৃণমূলের আকাশ থেকে তারা খসছে, খসবে আগামীদিনেও

সনাতন রায়

দু' বছর আগে যেদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড মুকুল রায় দলত্যাগ করে গেরুয়া শিবির বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, সেইদিনই পরিষ্কার হয়েছিল, তৃণমূলের আকাশ থেকে তারা খসা শুরু হলো। তারপর থেকেই তৃণমূল শিবিরকে দলত্যাগের আশঙ্কা গ্রাস করতে শুরু করে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁকে ঘিরে থাকা মোসাহেব ও কুশীলবরা যতই মুখে আস্ফালন করুন না কেন যে মুকুল রায়ের মতো 'বিশ্বাসঘাতকরা' দল ছাড়লে দলের ক্ষতির বদলে বরং মঙ্গলই হবে, আসলে বুক ধড়পড়ানি শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই। কারণ তৃণমূল মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে নেত্রীর জবরদস্তি প্রচার যতই প্রবল হোক না কেন, দলের সবাই এমনকী নেত্রী নিজেও জানেন, তৃণমূল স্তরে দলটিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন একজনই। তিনি মুকুল রায়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ব্যক্তিবিশেষের 'ইমেজ' ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেটা যেমন সত্যি, আবার এটাও অস্বীকার করা যাবে না, ব্র্যান্ডটাকে প্রচারের দায়িত্বও নিতে হয়। ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়। মানুষকে বোঝাতে হয়। না বোঝালে, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে না পারলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো কোনা ছাড়, একটা গুঁড়ো মশলার ব্র্যান্ডও ইমেজ নিয়ে টিকে থাকতে পারত না।

তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে ওই সেলসম্যানের কাজে একক দক্ষতা দেখিয়ে ছিলেন মুকুল রায় তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে। নইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্বার্থপর রাজনৈতিক নেত্রী মুকুল রায়কে দলের দ্বিতীয় প্রধানের শিরোপা কোনোদিনই দিতেন না। মুকুল রায় দল ছেড়েছেন সেদিনই যেদিন তাঁর গলা থেকে সম্মানের সূচকটি কেড়ে নিয়ে স্বয়ং নেত্রী তাঁর সদ্য নাবালকত্ব উত্তীর্ণ (বয়সে, রাজনীতিতে নয়) ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীর আসনে অভিষিক্ত করেছেন। দলের অভ্যন্তরে রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা ওই নব্য যুবরাজকে করলার রস গেলার মতো সহ্য করে নিলেও, মুকুল রায় পারেননি। হয়তো তিনি শিরদাঁড়াটাকে আর বেশি নোয়াতে পারেননি বলেই।

কিন্তু সেদিন থেকেই যে দলের ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল তা প্রকাশ্যে ধরা না পড়লেও, তৃণমূলের অন্দরমহলের কুশীলবরা ভালো করেই বোঝেন। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে তা বেশ স্পষ্ট যখন দু'জন বর্তমান সংসদ সদস্য সৌমিত্র খাঁ এবং অনুপম হাজরা দলত্যাগ করে যোগ দিলেন বিজেপি-তে। আর দলের মধ্যে প্রায় বজ্রপাত করে দল ছাড়লেন তৃণমূল নেত্রীর বিশ্বস্ত সৈনিক, ভাটপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিংহ যাঁকে হাতে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়েছিলেন কীভাবে গণতন্ত্রের মন্দির বিধানসভায় লুম্পেন-রাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কেমন করে বহুমূল্যের ঐতিহ্যবাহী আসবাবপত্রগুলি ভাঙচুর করতে হয় (নভেম্বর ১১, ২০০৬), আর কেমনভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর ২৪ পরগনায় ফলাফল বিরোধী শূন্য করতে হয়। অনুতাপের আগুনে পুড়তে পুড়তে অসহ্য হয়ে ওঠায় অর্জুন সিংহ এখন গেরুয়া শিবিরে।

অনুতপ্ত শুধু অর্জুন সিংহ, সৌমিত্র খাঁ কিংবা অনুপম হাজরাই নয়, দলের অভ্যন্তরে বড়ো, মেজো, সেজো নেতা-নেত্রীদের অনেকেই, কারণ সব নেতা-নেত্রীই যে কংগ্রেস ভেঙে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নিজেদের ধান্দা গোছাবার তালে, তা নয়। অনেকেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন,



মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মননশীলতা, সততা এবং সাহসের প্রতি সম্মান জানিয়ে। বামফ্রন্ট আমলে কংগ্রেস নেতাদের তরমুজসম (বাইরে সবুজ ভিতরে লাল) মানসিকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে দল ছেড়েছিলেন অজিত পাঁজার মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। কিন্তু তিনিও একটা সময় তৃণমূল শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে।

সেই বীতরাগ বছরে বছরে তীব্র হয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিচিত্র পরিবর্তন গোটা দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, দলের আভ্যন্তরীণ নেতা-নেত্রীরা তার উত্তাপ বুঝেছেন হাড়ে হাড়ে। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা প্রায় সকলেরই কারণ যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দল বড়ো হলো, ক্ষমতায় এল, তারাই এখন নেত্রীর কাছে দূরের বাসিন্দা। আর তাঁর প্রিয়জন- রাজনীতির বাইরের জগত থেকে (চলচ্চিত্র শিল্পী, শিল্পী, কবি, সাংবাদিক) উড়ে আসা পরিযায়ী পক্ষীযুথই তাঁর ঘনিষ্ঠ বলয়। রাজনীতির যাঁরা এখনও সেই বলয়ের শরিক, তাঁরা মূলত সংখ্যালঘু এবং মস্তান সদৃশ ব্যক্তিত্ব। কারণ নেত্রী জানেন, তাঁর রাজনীতির তুরুপের তাস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট আর মস্তানদের ছাপ্পা মারার কেরামতি।



২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে হঠাৎ করে চিত্রতারকাদের (দেব, মুনমুন সেন, সন্ধ্যা রায়, শতাব্দী রায়, তাপস পাল) এবং সেই সঙ্গে সাংবাদিক (সারদা চিটফান্ড খ্যাত কুণাল ঘোষ) এবং শিল্পী (যোগেন চৌধুরী)-দের ধরে বেঁধে এনে রাজ্যসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকে জলঘোলা হতে শুরু করেছিল। কিন্তু হাতের সামনে বিকল্প ছিল না।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের মুখে যখন বিজেপির শক্তি বেড়েছে, যখন বিকল্প হিসেবে রাজনীতিবিদদের সামনে হাজির নতুন সুযোগ, তখন এতদিন ধরে গুমরে থাকা নেতা-নেত্রীরা একটু একটু করে নড়াচড়া শুরু করেছেন।

যেমন বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্ত। তিনি শুধু মুকুল ঘনিষ্ঠই নন, দলের আর্থিক পুষ্টি তৈরির অন্যতম কারিগরও। সেই সব্যসাচী দত্তকে বিধাননগরের মেয়র পদে বসিয়ে মূল রাজনীতি থেকে ব্রাত্য করে রাখায় তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বারে বারে। এখন তিনি মুকুল রায়কে বাড়িতে বসিয়ে লুচি-আলুরদম খাইয়ে দলের অভ্যন্তরে সমালোচনা এবং হুমকির মুখে পড়লেও, লুচি-আলুরদমের পলিটিক্স থেকে বিরত হননি। বরং প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়েছেন, ভবিষ্যতে শুধু মুকুল রায় কেন, যে কোনও রাজনীতিরই কুশীলবরা তাঁর বাড়িতে এলে তিনি সৌজন্যের লুচি আলুরদম খাওয়াবেন। এমনকী মুকুল রায়কেও প্রয়োজনে আবার।

এবার নির্বাচনের দশ জন বর্তমান সংসদ সদস্যকে প্রার্থীপদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে সেসব আসনগুলি সেগুলি হলো— কোচবিহার, কলকাতা দক্ষিণ, দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম, বসিরহাট, মেদিনীপুর, বোলপুর, বিষ্ণুপুর এবং কৃষ্ণনগর। নতুন মুখ এসেছে অনেকগুলি। তার মধ্যে অত্যাশ্চর্য সংযোজন বাংলার দুই লাস্যময়ী চিত্রতারকা মিমি চক্রবর্তী এবং নুসরত জাহান। বসিরহাটে গত লোকসভা নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ইদ্রিশ আলিকে সরিয়ে উলুবেড়িয়া বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী করায় তিনি রীতিমতো ক্ষুব্ধ। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তিনি নাকি দলের ঘনিষ্ঠ মহলে ফোঁস করেছেন এই বলে যে 'আমি কেউটের বাচ্চা। যেদিন ছোবল দেব, সেদিন ঝাড়বংশে নির্বংশ হবে সব।' স্মরণ করতে দ্বিধা নেই— পার্ক সার্কাস, তপসিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কয়েকবছর আগের দাঙ্গার নেপথ্যকারিগর



২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের মুখে যখন বিজেপির শক্তি বেড়েছে, যখন বিকল্প হিসেবে রাজনীতিবিদদের সামনে হাজির নতুন সুযোগ, তখন এতদিন ধরে গুমরে থাকা নেতা-নেত্রীরা একটু একটু করে নড়াচড়া শুরু করেছেন।

ছিলেন এই ইদ্রিশ আলি। অপেক্ষায় আছেন, দল ছাড়বেন কবে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা বিপ্লব মিত্র আশা করেছিলেন, এবারে অন্তত উড়ে আসা জুড়ে বসা কলকাতার নাট্যকর্মী এবং চিটফান্ড কাণ্ডে পরোক্ষে জড়িত অর্পিতা ঘোষের বদলে তিনি বালুরঘাটে টিকিটিটি পাবেন। কারণ এলাকায় অর্পিতা ঘোষের উন্নয়নমূলক কাজের তেমন কোনো নজির এখনও দেখা যায়নি। দলের পোড়াখাওয়া এই নেতা এবং এলাকার বিশিষ্ট নাট্যকর্মী বিপ্লব মিত্র প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়েছেন, 'এবারে অর্পিতা ঘোষের জয় নিয়ে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। কারণ তিনি ছাড়া এখানে অনেক নেতাই রয়েছেন যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়ালে অবলীলায় জিততে পারতেন।' বার্তাটা স্পষ্ট। তিনিও দলনেত্রীকে এবার সবক শেখাবার অপেক্ষায়।

কোচবিহারের জয়ী প্রার্থী পার্থপ্রতীম রায়কে বিনা কারণে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে দলত্যাগী রাজ্যের

প্রাক্তনমন্ত্রী এবং নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পরেশ অধিকারীকে। ইতিমধ্যেই পার্থপ্রতীম রায় বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব তো প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়েছেন, 'জলঘোলা হবেই। এখানে কি নেতার অভাব ছিল যে পরেশ অধিকারীর মতো অর্ধশিক্ষিত একজন দলত্যাগী বামপন্থীকে লোকসভায় পাঠাতে হবে?' মালদা উত্তর আসনে প্রার্থী করা হয়েছে সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী মৌসম বেনজির নূরকে। এ নিয়ে এলাকায় অসন্তোষ জোরদার।

মুর্শিদাবাদ আসনে এলাকার যুবনেতা এবং প্রখর সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন তৃণমূল নেতা সৌমিক হোসেনকে পাত্তাই দেওয়া হয়নি। তাঁকে উপেক্ষা করে প্রার্থী করা হয়েছে প্রায় সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী বিধায়ক আবু তাহেরকে। উপেক্ষিত সৌমিকও যোগাযোগ রাখছেন গেরুয়া শিবিরে।

এলাকায় এলাকায় এখন ছড়িয়ে পড়েছে অসন্তোষের বীজ। নেত্রী যতই মনে করুন না কেন, তাঁর দল অভেদ্য, তাঁর দল রাজস্থানের কেল্লার মতোই মজবুত এবং বিগত নির্বাচনের মতোই তিনি হেসে খেলে ছাপ্পা ভোটের খেলা খেলে পার হয়ে যাবেন নির্বাচনী বৈতরণী, তাহলে ভুল করবেন। গত পাঁচ বছরে বিজেপি শুধু শক্তি সঞ্চয়ই করেনি, তৃণমূলের গোড়ায় গোড়ায় বাসা তৈরি হয়ে গেছে ধ্বংসাত্মক উইপোকার। যারা বার্তা বহন করছে, এবার পতন অনিবার্য। প্রতিদিন খসে পড়া তারার সংখ্যা বাড়বে এবং নিষ্প্রভ হতে থাকবে তৃণমূল।

প্রবাদ বলে, তুমি যেমন বীজ বুনবে, ফসল হবে তেমনি। তৃণমূল কংগ্রেস দলটার শেকড়ই হলো দলত্যাগের আদর্শ। নেত্রী নিজেই কংগ্রেস দলটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন, এই কংগ্রেস দলই তাঁর হয়ে প্রাণপণ লড়াই করে সিপিএমের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো দক্ষ সাংসদকে হারিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিতিয়ে এনেছিল। কৃতজ্ঞতাবোধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি দলত্যাগ করেই ক্ষান্ত হননি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, অজিত পাঁজা, মুকুল রায়ের মতো নেতাদেরও দল ভাঙতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেই প্রবাহ চলেছে অবিরাম। শুধুমাত্র ২০১৬ সালে দ্বিতীয়বার তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠার পর বামফ্রন্টেরও ১৭ জন বিধায়ক এবং তিনজন সাংসদকে দলত্যাগ করিয়ে নিজের দলে টেনেছেন হয় ভয় দেখিয়ে, না হয় নানা লোভে প্ররোচিত করে। সেই প্ররোচনা আজও অব্যাহত। এমনকী শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা, স্মরণীয় রেলমন্ত্রী, বাংলার নব রূপকার বরকত গণি খান চৌধুরীর পরিবারের কংগ্রেসি ঘরানার শিকড়েও তিনি আঘাত হানতে দ্বিধাবোধ করেননি।

এবার তার প্রতিফল ঘটতে শুরু করেছে। একথা সবাই জানে, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও রাজনৈতিক দল নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জমিদারি। দল চলে তাঁর মর্জিতে। কোনো রাজনৈতিক মুনশিয়ানায় নয়। ফলত দলের কিছু মুষ্টিমেয় নেতা-কর্মী ছাড়া বাকি সকলেরই স্বাধীনতা সীমিত। প্রতি পদে তাঁদের অপমানিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, পদানত হতে হয়। কেউ জানেন না, কখন কার ডানা ছাঁটা হবে। এই ভাবেই অপমানিত হয়ে একসময় দল ছেড়ে গিয়েছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জিও। জেলে বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছে সাংসদ কুনাল ঘোষকে। চিত্রতারকা সাংসদ তাপস পাল জেলের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষলেও নেত্রী ফিরেও তাকাননি। আজ যদি এই সব নেতা-কর্মীরা একযোগে বিদ্রোহ করেন, একযোগে গলা মেলান— দল আমাদেরও। দল কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাহলে কি অন্যায় হবে?

প্রবীণ নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিলেন মমতা। সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে এবার নির্বাচনে কলকাতা ছাড়া করেছেন নেত্রী। সুব্রত এবার বাঁকুড়ার প্রার্থী। বাহাত্তরোর্ধ্ব সুব্রতকে জীবনে কখনও কলকাতার বাইরে প্রার্থী হতে হয়নি। এবার যে বাঁকুড়া আসনটি তৃণমূলের হাতছাড়া হবার সমূহ সম্ভাবনা, সেখানে মমতা পাঠালেন তাঁর দীক্ষাগুরুকে। সুব্রত এ অপমান মেনে নেবেন?

সৌগত রায়, একা কুম্ভ হয়ে পার্লামেন্টে দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় শুধুই এমপি। দলে এর চেয়ে বেশি সম্মান তিনি কোনোদিনই পাননি। তাঁরও ক্ষোভ আছে অনেক। যদিও শিক্ষিত মানুষ বলে, তাঁর ক্ষোভের প্রকাশটা অন্যরকম। আর তাছাড়া সুব্রত, সৌগত দুজনেই ফেঁসে আছেন নারদা মামলায়। ফেঁসে গিয়েও অবশ্য এবারও প্রার্থী হয়েছেন কাকলী ঘোষ দস্তিদার, অপরূপা পোদ্দার। সাজদা আমেদ নতুন প্রার্থী। তাঁর স্বামী সুলতায় আমেদও নারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত ছিলেন। তিনি এখন প্রয়াত। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ফেঁসে রয়েছেন রোজভ্যালি চিট ফান্ড মামলায়। তবুও তিনি এবারও প্রার্থী। এই সব অভিযুক্ত প্রার্থীদের নিয়েও দলে কোঁদল অব্যাহত।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দলের কোন্দল তত তীব্র হচ্ছে। আর ততই অপমানের বোঝা বাড়ছে নেত্রীর দিক থেকে। তাঁর নয়া নির্দেশ— এবার প্রচারে সব প্রার্থীকেই বলতে হবে--- প্রার্থী তিনি নন, প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদিন 'অনুপ্রেরণা'-র রাজনীতি করেছেন। এখন সরাসরি 'একমেবাদ্বিতীয়ম' হিসেবে নিজেকে প্রোজেক্ট করা। অর্থাৎ প্রার্থীদের ব্যক্তিসত্তা বিপন্ন। এতদিন শুধু স্বাধীনতা ছিল না। এখন অস্তিত্বটাই হাওয়া হয়ে যেতে বসেছে। ভাবতে পারা যায়— সৌগত রায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শিশির অধিকারীর মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদরা যাঁরা এখনও রাজনীতির দাবার চাল কী তা শিখিয়ে দিতে পারেন বহু রাজনীতিবিদকেই, তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন— 'আমাদের ভোট দিতে হবে না। আমার নামে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট দিন।'

এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গলায় ফাঁস দিতে চেয়েছিলেন প্রকাশ্য রাজপথে। এখন কি বাকি নেতাদের পালা? কী ভয়ংকর অসম্মান আর লজ্জার মুখোমুখি তাঁরা। এ অপমানের প্রতিশোধ তুলবেন না তাঁরা? একথা এখন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার— সর্বভারতীয় পর্যায়ে মোদী-জমানার রাজ হাজার অপপ্রচার সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও রাজনীতির হাওয়ার উড়ছে গেরুয়া রঙ। হয়তো রাতারাতি রাজপ্রসাদ গড়ে উঠবে না— কিন্তু একটা শক্তপোক্ত ইমারত এবার গড়বেই মানুষ। অসহ্য তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে।

আর তখনই শুরু হবে তারা খসা। ভোটের আগেই কিছুটা। বাকিটা ভোটের অব্যবহিত পরেই। তখন কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানের কাছেও অন্য এক কবি গুনগুন করে শোনাবেন—

হঠাৎ ঘুম ভাঙে
তারা খসার শব্দে
আবার—আবার এক নক্ষত্রের পতন!

মুরারীপুরে ‘প্রশান্ত মণ্ডল স্মারক সমিতি’র উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও কৃতী বিদ্যার্থী-মাতৃ সংবর্ধনা

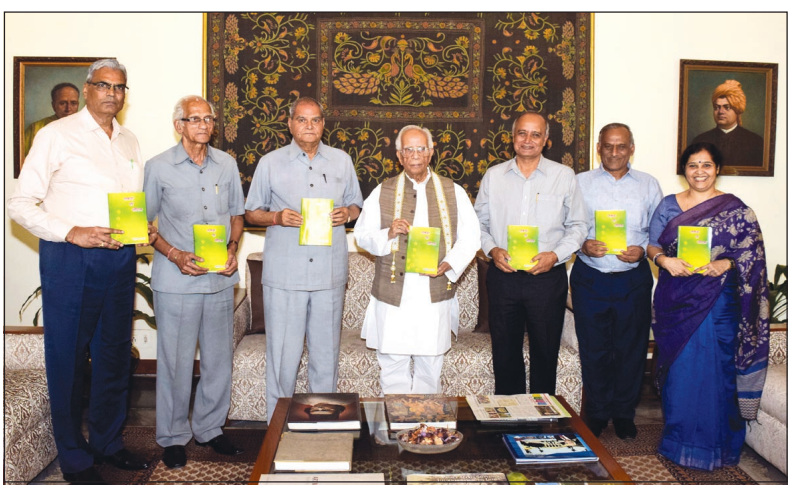
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার মুরারীপুর গ্রামে গত ১৬ মার্চ ‘বীর প্রশান্ত মণ্ডল স্মারক সমিতি’র উদ্যোগে রক্তদান শিবির, কৃতী বিদ্যার্থী-মাতৃ সংবর্ধনা ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় রক্তদান শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা গৌতম সরকার। এক জন মহিলা সহ ৩৫ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন জেলা সদর হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের কয়েকজন কর্মী। বিকেল ৩ টায় এলাকার সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা ১০ জন কৃতী বিদ্যার্থীর মাকে শাল,মানপত্র ও একটি করে পুস্তক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কয়েকজন বিদ্যার্থী তাদের জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা বর্ণনা করেন, কয়েকজন মা-ও তাদের সন্তান সম্পর্কে কিছু বলেন। এরপরই শুরু হয় স্মরণ সভা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ



প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ তপন দাস, প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ সাহা এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর ক্ষেত্রের কার্যকর্তা করুণা প্রকাশ, পূর্ব ক্ষেত্রের সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি প্রকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বর্গীয় প্রশান্ত মণ্ডলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন সবাই। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে ১৬ ডিসেম্বর মুরারীপুরে সঙ্ঘের শাখা চলাকালীন রাজনৈতিক- আশ্রিত স্থানীয় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে প্রশান্ত মণ্ডল বীরগতি প্রাপ্ত হন। প্রশান্ত মণ্ডলের স্মৃতিচারণ করেন মুরারীপুর শাখার তৎকালীন মুখ্যশিক্ষক ধীরেশ চন্দ্র তালুকদার। শ্রীদত্ত তাঁর ভাষণে রাষ্ট্র নির্মাণে স্বয়ংসেবকদের এবং মানুষ্য নির্মাণে মায়েদের ভূমিকার কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা কার্যবাহ সুমন দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অলক মুস্তাফি।

রাজভবনে রাজস্থানি কাব্যগ্রন্থের উন্মোচন

বিশিষ্ট রাজস্থানি সাহিত্যিক ও কবি তথা কুমারসভা পুস্তকালয়ের সাহিত্য মন্ত্রী বংশীধর শর্মার রাজস্থানি কাব্যগ্রন্থ ‘ সবদাং রী সৌরম’-এর উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ১৭



মার্চ কলকাতার রাজভবনের সভাকক্ষে। কাব্যগ্রন্থের উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

তিনি বলেন, কাব্যগ্রন্থ সাহিত্যপ্রেমী মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে তার সঠিক মূল্যাঙ্কন হবে। কবি বংশীধর শর্মা রাজ্যপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যপাল মহোদয় স্বয়ং সরস্বতী সাধক, তাঁর করকমলে আমার কাব্যগ্রন্থের উন্মোচন গর্ব ও আনন্দের বিষয়। উল্লেখ্য, রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে সোহনলাল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আর্থিক আনুকূল্যে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজস্থান পরিষদের অধ্যক্ষ শার্দূল সিংহ জৈন, মহামন্ত্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ড. তারা দূগড় এবং কুমারসভা পুস্তকালয়ের মন্ত্রী মহাবীর বজাজ ও সমাজসেবী অশোক কোঠারী।

কাটোয়ায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

গত ১৬-১৭ মার্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার ছাতনি সরস্বতী শিশুমন্দিরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গের আয়োজন করা হয়। মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত তিনটি শাখা – বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ (প্রাথমিকস্তর),



বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর), জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ (উচ্চশিক্ষা স্তর)-এর ১১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অভ্যাস বর্গে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১১টায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার দিয়ে বর্গের শুভারম্ভ হয়। পুলওয়ামায় বীরগতি প্রাপ্ত সেনা জওয়ান এবং পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বাস দুর্ঘটনায় নিহত পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বর্গে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় অভ্যাস বর্গের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। শ্রীকাপুর বলেন, একজন শিক্ষকের কাজ হলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমী ও সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এই কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে পারলেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান সমাজের কাছ থেকে পাবেন। তিনি জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ দ্বারা সম্পাদিত কার্যকর্তাদের উদ্দেশে রচিত 'কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ-২০১৯' পুস্তিকাটি উন্মোচন করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁদের নিজের শক্তিতেই এগিয়ে যেতে হবে। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অতুল কুমার বিশ্বাস বলেন, গণতন্ত্রে ভোটদান রাষ্ট্র সচেতন নাগরিকের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শক্তিশালী দেশ গঠনের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দানের আবেদন জানান তিনি। শেষ পর্বে ছিল প্রশ্নোত্তর। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শ্রীকাপুর। সেনা জওয়ানদের উদ্দেশে সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষক গৌরাঙ্গ অয়স। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন শ্রীকাপুর।

প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস এবং দ্বিতীয় অধিবেশন পরিচালনা করেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাস।

সেবা ভারতীর উদ্যোগে সেবা প্রমুখদের প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ৯-১০ মার্চ সেবা ভারতীর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সেবা প্রমুখদের সেবা প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয় বকুলতলা ব্লকের দাড়া গ্রামের মাতঙ্গিনী শিশুবিকাশ কেন্দ্রে। জেলার বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র থেকে ১৭ জন মহিলা সহ ৩১ জন সেবা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকরী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস, সমিতির সহ সম্পাদক প্রদ্যুৎমল বসু, কার্যকরী সমিতির সদস্যা কৃষ্ণা পাল।





ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার আজও সমান প্রাসঙ্গিক

অম্লানকুসুম ঘোষ

ঈশ্বরের প্রিয় দেশ ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে ভারত সূর্য যখনই মোহিনী মায়ায় মগ্ন হয়েছে তখনই যুগ পরিবর্তক মহাপুরুষগণ এই পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন এই দেশ এবং জাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে। যুগে যুগে ভারতভূমে আবির্ভূত এই মহাপুরুষদেরই অন্যতম হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি ডাক্তারজী নামেই খ্যাত ছিলেন।

ডাক্তারজীর জীবনকথা আলোচনা করার পূর্বে সে সময় দেশের এবং সমাজের অবস্থা কেমন ছিল তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে দেশের মানুষের মনে হীনম্মন্যতা বাসা বেঁধেছিল। মুসলমান আমলে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছিল এবং ইংরেজ আমলে

বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ফলস্বরূপ দেশবাসীর মনে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদেশিদের সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সমাজের গ্রন্থীসকলও শিথিল হচ্ছিল। ভারতবর্ষ ও হিন্দুসমাজের পুনরুত্থান তখন সকলের কাছেই স্বপ্নবৎ বোধ হচ্ছিল।

দেশ ও জাতির এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ডাক্তারজী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৯ সালের ১ এপ্রিল, মহারাষ্ট্রের (তৎকালীন মধ্যপ্রান্ত) নাগপুরে। দেশপ্রেমের জ্বলন্ত হুতাশন তাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেয়েছিল। ১৮৯৭ সালে যখন তাঁর মাত্র আট বছর বয়স তখন ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য নিজেদের শাসনকে দৃঢ় করার জন্য এবং ভারতীয় শিশুদের মগজধোলাই করার জন্যই এই পদক্ষেপ করেছিল ব্রিটিশ সরকার, কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় সমাজ এত নিদ্রামগ্ন এবং দাসসুলভ দুর্বলতায় আকীর্ণ ছিল যে ইংরেজদের এই পরিকল্পনা কেউই বুঝতে পারেনি। শিশুরা তো বটেই শিশুদের অভিভাবকগণও দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ পাওয়া এই মিষ্টি নিয়ে আনন্দে মত্ত ছিল, কিন্তু দেশপ্রেমের অনির্বাণ প্রদীপ যার হৃদয়ে সদা দীপ্যমান কেশব শিশু বয়সেই বুঝতে পেরেছিল যে এই মিষ্টি দাসত্বের রসে জারিত ও গোলামির পাকে নির্মিত। তিনি ফেলে দিয়েছিলেন সেই মিষ্টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে সময় ইংরেজ সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে তিনি কোনওরকম জাতীয়তাবাদী শিক্ষা পাননি, বরং ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসায় ভরা ছিল সে সময়কার পাঠ্যসূচি। নিজের পরিবার বা সামাজিক পারিপার্শ্বিক থেকেও তিনি তেমন কোনও শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে কোনও উল্লেখও পাওয়া যায় না। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তখনও দেশের আনাচে কানাচে সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। তবুও শিশু বয়সের কেশব দেশপ্রেমের যে

নিদর্শন রেখেছিলেন সেই দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই বর্তমান ছিল। 'great men think alike' কথাটির যথার্থতা এখানেই প্রমাণ হয়। ইংরেজি স্কুলে পড়া, বাংলা না জানা বালক সুভাষচন্দ্র যখন নিজের সাহেবি পোশাক এবং বাংলা না জানার জন্য লজ্জিত হন, শৈশব থেকে বিলেতে মানুষ ঋষি অরবিন্দ যখন স্বদেশি ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন তখন তাঁদের মধ্যে দেশেপ্রেমের যে স্বতঃউৎসারিত স্রোতস্বিনীকে অন্তঃসলিলা ফল্গুবৎ প্রবাহিত হতে দেখা যায়, দেশপ্রেমের সেই একই স্রোতস্বিনী সদ্য যুবক কেশবের মনকেও সিক্ত করেছিল। তাঁর জীবনে স্বাদেশিকতার দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ১৯০৮ সালে, বিজয়া দশমীর সময় গ্রামের রাবণ বধ অনুষ্ঠানে। তিনি বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেন ও ফলস্বরূপ পুলিশের রোষে পড়েন। তখন তিনি তার কাকা আবাজী হেডগেওয়ারের বাড়িতে থাকতেন। ব্রিটিশ সরকার তার কাকাকে বলে যাতে তিনি তার ভাইপোকে এর জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে নতুবা চাকরির ভয় দেখানো হয়। তাঁর কাকা প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে দেন। এই বছরেই তাঁর স্কুলে স্কুল ইন্সপেক্টর এলে কেশবের নেতৃত্বে ছাত্রদের অনেকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেয়, তাদের সকলকে সাসপেন্ড করা হয়। কিছুদিন পরে বেশ কিছু ছাত্র ক্ষমা চেয়ে স্কুলে ফিরে যায়। কেশবের নেতৃত্বে বেশ কিছু ছাত্র তখনও অনড় থাকে। তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি মধ্যপন্থা নেন, বলা হয় ক্ষমা চাইতে অনিচ্ছুক সব ছাত্রকে একটি সারিতে দাড় করিয়ে তাদের প্রশ্ন করা হবে 'তোমরা অন্যায় করেছ?' তখন তারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াবে। অভিভাবকদের চাপে বাকি ছাত্ররা এই ব্যবস্থায় রাজি হলেও কেশব রাজি হয়নি, ফলস্বরূপ তিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন।

এসময় ঋষি অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ মহান নেতারা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে 'The national council of education' স্থাপন করেছিলেন। এই কাউন্সিলের অন্তর্গত একটি বিদ্যালয় যবতমলে ছিল। কেশব সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯০৯ সালে। তার প্রমাণপত্রে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের স্বাক্ষর ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ডাক্তারি পড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য, তিনি চাইলে মুম্বাই বা মহারাষ্ট্রের অন্য কোথাও ডাক্তারি পড়তে পারতেন। কিন্তু তিনি সুদূর বঙ্গপ্রান্তে ডাক্তারি পড়তে আসেন একটিই কারণে, তখন বাংলা ছিল বিপ্লবীদের পীঠস্থান। বিপ্লবী দলে যোগদান করার জন্যই তার বাংলায় আগমন।

বাংলায় আসার পর কেশব স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলস্রোতে অংশ নিলেন। তার জীবনের এক মহান অধ্যায়ের সূচনা হলো। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। বিশিষ্ট বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তার আত্মজীবনী 'জেলের মধ্যে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে (পৃ. ১৫১) বলেছেন ডাক্তারজীর সহপাঠী বিশিষ্ট নলিনী কিশোর গুহ ডাক্তারজী ও বীর সাভারকরের অনুজ নারায়ণ রাও সাভারকর (ডাক্তারজীর আরেক সহপাঠী)-কে অনুশীল সমিতিতে নিয়ে আসেন। ওই সময় আরেক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। কলকাতায় অবস্থানকালের পাঁচ বছরে ডাক্তারজী বোমা তৈরি, বন্দুক চালানো ইত্যাদি বিপ্লবীজনোচিত কাজে পটু হন এবং সংগঠনের কাজেও পারদর্শী হন। বিপ্লবীদলে তাঁর ছদ্মনাম হয় 'কোকেন'।

১৯১৪ সালে ডাক্তারজী ডাক্তারি পাশ করেন। এই সময় জাতীয় বিদ্যালয় থেকে পাশ করা ব্যক্তিদের সরকার ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি দিত না। তার প্রতিবাদে ডাক্তারজী আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জি এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। ডাক্তারজীর এই আন্দোলনে অনুষ্ঠিত এক সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সভাপতিত্ব করেন। ডাক্তারজীর এই আন্দোলনের ফলে সরকার মধ্যপন্থা গ্রহণ করলো, সরকার বললো যে জাতীয় বিদ্যালয় থেকে পাশ করা ব্যক্তিদের একটি পরীক্ষা নিয়ে সরকার ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। ডাক্তারজীর বাকি সহ আন্দোলনকারীরা এতে রাজি হলেও ডাক্তারজী এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তার বক্তব্য ছিল, বিদেশি সরকারের কোনও অধিকার নেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের পুনরায় পরীক্ষা নেবার।

ডাক্তারি পাশ করে কলকাতা থেকে নাগপুরে ফিরে এসে ডাক্তারজী সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। ইংরেজদের দুর্বলতার সুযোগে এক বড়ো বিপ্লবী আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। কামঠীর সৈন্য শিবির থেকে বেশ কিছু অস্ত্র তারা হস্তগত করেন এবং বামনরাও ধর্মাধিকারীকে গোয়া পাঠিয়েছিলেন জাহাজ পথে আসা কিছু অস্ত্র নামানোর জন্য। কিন্তু ইংরেজরা আগে সংবাদ পেয়ে জাহাজটিকে কবজা করে নেয়। এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দের সঙ্গেও ডাক্তারজীর যোগাযোগ ছিল। এই সময়েই রাসবিহারী বসু, বাঘাযতীন প্রমুখ বিপ্লবী জার্মানি থেকে অস্ত্র এনে বিপ্লব করবার একটা প্রয়াস করেছিলেন। তাদের প্রয়াসের সঙ্গে ডাক্তারজীর যোগ ছিল কিনা সে ব্যাপারে ইতিহাস নীরব। তবে বিপ্লবের ইতিহাস সবসময় সব খুঁটিনাটি প্রকাশ করে না, তাই আনুমানিকভাবে বলা চলে একই সময় একই উদ্দেশ্যে চালিত দুই বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় থাকলেও থাকতে পারে। রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীনের প্রচেষ্টা সফল হয়নি, ডাক্তারজীর তৎকালীন বিপ্লব প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। তাঁদের মতোই ডাক্তারজীও বিফলমনোরথ হয়ে ভেঙে পড়েননি। পরবর্তীকালে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।

ডাক্তারজীর পরবর্তী কর্মকাণ্ড অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময়। গোটা দেশেই তখন বিপ্লবীরা এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মত ছিল অহিংস হলেও এতবড়ো আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত থেকে তারা ব্রিটিশ বিরোধিতা বেশি করে করতে পারবে। একই চিন্তা থেকে ডাক্তারজীও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। সরকারবিরোধী বক্তব্য রাখার জন্য তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, এই সম্বন্ধীয় বিচার চলাকালীন বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা দেখে বিচারক বলেছিলেন যে আত্মপক্ষ সমর্থনে দেওয়া বক্তব্য তার মূল বক্তব্যের চেয়েও বেশি রাজদ্রোহমূলক।

কারাগারে থাকাকালীন তিনি কারাগারে তাঁর সহবন্দিদের মধ্যে স্বার্থচিন্তা ও বিশৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পান। তিনি কারাগারে থাকাকালীনই চৌরিচৌরার ঘটনা ঘটে এবং

অসহযোগ প্রত্যাহৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতিরা মালাবার অঞ্চল-সহ বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। ইতিপূর্বে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং বর্তমানে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা তার মনে এই উপলব্ধি এনে দেয় যে প্রথমে আমাদের সমাজকে স্বার্থচিন্তাশূন্য ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, না হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হবে এবং যদি বা স্বাধীনতা আসে তাহলেও সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। এই উপলব্ধি থেকে তিনি কারাগার থেকে মুক্তির পরে ১৯২৫ সালে ১৫-২০ জন তরুণকে নিয়ে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণদেবের মতো তিনিও কাঁচা হাড়িতে দুধ রাখতে চেয়েছিলেন, তাই বয়স্কদের না নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছিলেন শুধুমাত্র যুবকদের নিয়ে। মাত্র ১৫-২০ জন তরুণকে নিয়ে স্থাপিত সেদিনের সেই চারাগাছ আজ মহীরুহ হয়ে গোটা দেশকে ছায়াশ্রয় প্রদান করছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অরাজনৈতিক ভাবে স্থাপন করলেও দেশের প্রয়োজনে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেও তিনি দূরে সরে থাকেননি। ১৯৩০ সালে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে তিনি জঙ্গল সত্যাগ্রহ করে কারাগার বরণ করেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অরাজনৈতিক রাখার জন্য তিনি সত্যাগ্রহ করার আগে সঙ্ঘের সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন এবং স্বয়ংসেবকদের বলেছিলেন যে কেউ চাইলে সত্যাগ্রহ রতে পারে কিন্তু তার আগে তাকে সঙ্ঘের সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হবে। এভাবে তিনি দেশের প্রয়োজনে রাজনৈতিক আন্দোলন করা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখা এই দুইয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন।

ডাক্তারজীর জীবৎকালেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যথেষ্ট বিস্তারলাভ করে। সঙ্ঘের দেশপ্রেম ও অনুশাসনের কথা শুনে স্বয়ং গান্ধীজী সঙ্ঘের শাখা দেখতে এসেছিলেন। গান্ধীজী সঙ্ঘের শাখাতে ব্রাহ্মণ হরিজন সবাইকে সব ভেদাভেদ ভুলে এক পংক্তিতে বসে খেতে দেখে অবাক হয়ে সঙ্ঘের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং সঙ্ঘের কাজের জন্য স্বয়ংসেবক ছাড়া কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয় না শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সঙ্ঘের কথা শুনে নেতাজীও ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দুর্ভাগ্যবশত ডাক্তারজী তখন মৃত্যুশয্যায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন তাই উভয়ের বাক্যবিনিময় হয়নি। কিন্তু একথা বলাই যায় গান্ধীজী ও নেতাজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই চিরবিরোধী মহারথী ডাক্তারজীর স্থাপিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যাপারে একমত ছিলেন। গান্ধীজী ও নেতাজী ছাড়াও মদনমোহন মালব্য, বিটঠলভাই পটেল প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাক্তারজীর জীবৎকালেই তাঁর স্থাপিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় এসে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর মধ্যে মদনমোহন মালব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে দেবেন এ কথা জানালে ডাক্তারজী বলেছিলেন পণ্ডিতজী টাকা নয়, শুধু আপনার আশীর্বাদ দিন। অর্থের প্রতি তাঁর এই নিরাসক্ত মনোভাবের কারণেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ এই বিরাট বিস্তৃতিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

আজ যখন বিদেশি সংস্কৃতিতে পুষ্ট কতিপয় দেশীয় ছাত্র দেশকে ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে, দেশবিরোধী শক্তি যখন ভারতের স্বাধীনতা গ্রাস করতে সদা তৎপর, দেশের কিছু মানুষ আজ যখন বিদেশির অনুকরণে সদাব্যস্ত, দেশের সংস্কৃতি আজ যখন দেশবাসীর দ্বারাই পদদলিত, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যখন প্রকাশ্যে দেশকে টুকরো করতে কৃতসংকল্প, সন্ত্রাসবাদ যখন দেশকে নিয়মিত আঘাতে জর্জরিত করছে, তখন ডাক্তারজীর আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করেই আমরা নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে পারি। ■

ডাক্তারজীর বাণী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অর্থ— রাষ্ট্র সেবার জন্য নিজের প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ লোকেদের দ্বারা রাষ্ট্রকার্যের জন্য স্থাপিত সঙ্ঘ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোক নিজ রাষ্ট্রের সেবার জন্য এইরূপ সঙ্ঘ নির্মাণ করিয়া থাকে। এই প্রিয় হিন্দুস্থান আমাদের দেশ। এই পবিত্র হিন্দুরাষ্ট্র— আমাদের কর্মভূমি বলিয়া আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এই সঙ্ঘকে আমাদের দেশে স্থাপিত করিয়াছি এবং ইহার দ্বারা আমরা রাষ্ট্রের সবদিক দিয়া উন্নতি করিতে চাই।

* * *

প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার যে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ কী? কোনও ঘন জঙ্গল, জলহীন মরুভূমি কিংবা কোনও নির্জন ভূভাগকে রাষ্ট্র বলে না। যে ভূভাগে এক বিশিষ্ট জাতির, বিশিষ্ট ধর্মের, বিশিষ্ট পরম্পরা সম্পন্ন ও বিশিষ্ট চিন্তাধারার লোক বাস করে সেই ভূভাগকেই রাষ্ট্র বলে। তাহাদের নামেই সেই রাষ্ট্রের নাম হয়। এইরূপ লোকেদের হিতাহিত কল্পনা এক হওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের একাত্মতার সৃষ্টি হয়। যাহাদের সংস্কৃতি আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা, ইতিহাস আলাদা, কী ভালো কী মন্দ সেই সম্বন্ধে যাহাদের মনে পরস্পর-বিরোধী কল্পনা আছে, যাহারা পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে করে, যাহাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ন্যায় এবং যাহাদের একত্রিত থাকার কারণও এক নয়, সেইরূপ লোকের সমষ্টি মাত্রকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া চলে না।

* * *

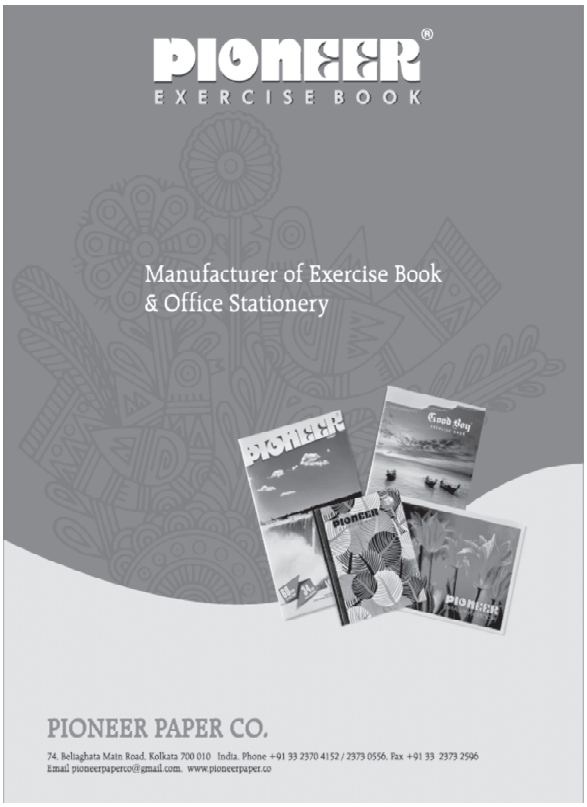
আমাদের নিজেদের ইতিহাসের ভিত্তিতে চিন্তা করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আজ আমরা ছত্রপতি শিবাজীর যুগে নাই। আজ আমরা এমন যুগে বাস করিতেছি যেখানে কেবল মানুষ কেন প্রত্যেকটি গাছেরও হিসাব রাখা হয়। আর প্রত্যেক রাস্তা মাপা হইয়াছে, মাইল হিসাবে নয় ইঞ্চি হিসাবে। এই জন্য বাহিরের পৃথিবী হইতে চোখ ফিরাইয়া জীবন ধারণ পর্যন্ত অসম্ভব। তোমরা উৎসাহ গ্রহণ করো নিজেদের দেশের ইতিহাস হইতে। ইহার জন্য পৃথিবীর দিকে দেখিবার কোনো বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপারে বাহিরের দিকে দেখা উচিত এবং পরিস্থিতি ভালো করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

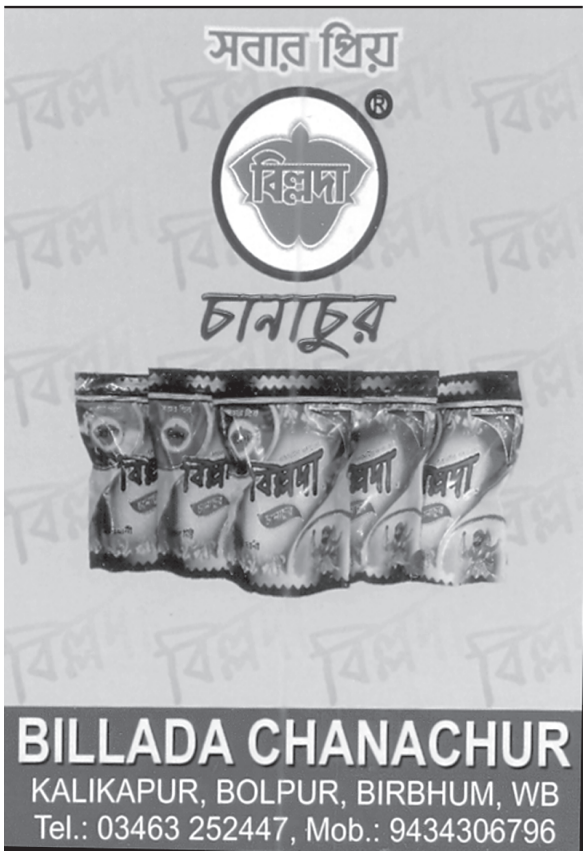
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



মমতা ব্যানার্জির প্রতিটি পদক্ষেপ স্বৈরাচারের পদধ্বনি



সুজাত রায়

হ্যাঁ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাডলফ হিটলার, সাদ্দাম হোসেন, জোসেফ স্টালিন, গদ্দাফি, বেলারুশের আলেকজন্ডার লুকাশেন্‌কা কিংবা ওসামা বিন লাদেনের মতো Totalitarian Dictator নন। আসলে তিনি হতে চেয়েছিলেন আধুনিক তুর্কিস্থানের কামাল আতাতুর্ক কিংবা সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ-র মতো Benevolent Dictator অর্থাৎ উপকারী স্বৈরাচারী। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন—কারণ আদপে তিনি Saddist বা চরম মানসিক বিকারগ্রস্ত, তাই ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য সব ধরনের অপকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলায় এখন মনোবিদদের ভাষায় পুরোপুরি 'Masterful Liar' (চরম মিথ্যাবাদী), Power Hungry (ক্ষমতা-আগ্রাসী), Paranoid (চরম অবিশ্বাসী), এবং Narcisist (নিজেকে যারা প্রথম সারির মানুষ মনে করেন) হয়ে উঠেছেন। ঠিক এমন চরম মানসিক বিকার থেকেই গদ্দাফি বা লুকাশেন্‌কা যখন তখন বিনা কারণেই যেখানে সেখানে আক্রমণ হানতেন। ওসামা বিন লাদেন ধ্বংস করেছিল আমেরিকান Twin Tower। কাজে সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী মানেই Psychopathic Megolomaniac অর্থাৎ এরা নিজেদের ভগবানের মতো সর্বশক্তিমান বা Omnipotent হিসেবে তুলে ধরতে কোনো যোগ্যতা ছাড়াই। আর সম্ভবত সেজন্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথায় কথায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনো বিরোধী শক্তিকে মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না। Bandless appetite for power—একাই ভোগ করব সব—মানসিকতাটা এমনই। এর কারণও আছে। মনোবিদরা বলছেন, জীবনে যারা চরম বঞ্চনার শিকার---তাঁরাই এই মনোবিকৃতির শিকার হন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তাঁকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। অর্থের অভাবে তাঁকে মানুষ হতে হয়েছে মামাদের দয়ায় মামার বাড়িতে। কিন্তু সমস্যা হলো—একজনের ব্যক্তিগত জীবনের বঞ্চনার শিকার হয় গোটা দেশ, গোটা দেশের মানুষ। কারণ বিরোধীহীন রাজনীতি রাজনৈতিক ভারসাম্যের শিকড়ে আঘাত হানে, যেমনটি এখন হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেনে, নাইজেরিয়ায়। এর ফলে শাসকের অত্যাচার বাড়ে। রাষ্ট্র অশান্ত হয়ে ওঠে। দুর্নীতি চরমে পৌঁছয়। অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় আর উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিদিন সেই পথেই পা বাড়াচ্ছে। দুর্নীতির এমন কালো মেঘ এর আগে পশ্চিমবঙ্গে কখনও দেখা যায়নি। রাজ্যের অর্থনীতি পুরোটাই ঋণসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। উন্নয়নের নামে চলছে রাজ্যকে পাউডার মাখিয়ে মুখের দাগ ধামাচাপা দেবার প্রচেষ্টা। সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠস্বর চেপে ধরা হয়েছে। বেশ কিছু অর্ধশিক্ষিত এবং সুযোগসন্ধানী অপদার্থ সাংবাদিককে সোনায় মুড়ে দিয়ে তাদের দিয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচার চলছে। আমলাতন্ত্রকে পোষ্যপ্রাণীতে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে গলায় দড়ি বেঁধে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গোয়ালে। আর নিজের দলে যারা মাঝে মাঝে ট্যাঁ-ফোঁ করতেন তাদের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে সারদা নারদার মতো দুর্নীতির অভিযোগ। এদিক ওদিক করলেই ঘ্যাচাং ফুঃ। গলা নেমে যাবে ধড় থেকে।

রাজ্যের তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের সর্বশেষ নমুনাটি হলো চিত্র পরিচালক অনিক দত্তের 'ভবিষ্যতের ভূত' সিনেমাটিকে আচম্বিতে বন্ধ করে দেওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারিতা কী ভয়াবহ তার প্রমাণ হিসেবে আমি এখানে হাজির করছি হোয়াটস অ্যাপের পাওয়া একটি অতি সাম্প্রতিক বার্তা। লেখক জনৈক সুদীপ্ত বোস।

''শিলঙে জেরায় রাজীব কুমার বলেছেন, 'হায়ার অথরিটি'। কলকাতায় সিনেমা হলের মালিকও বলছেন, 'ওপর মহলের চাপ আছে, তাই সিনেমাটি তুলে নেওয়া হচ্ছে।'

কে এই 'ওপর মহল', গত সাত বছরের পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রকেট সায়েন্স পড়ার দরকার হবে না। রসিকতা, মৃদু স্যাটায়ার। এটুকুও নিতে পারেন না 'অনুপ্রেরণা।' একটা সিনেমা মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে মুক্তি পেলো। এদিন দুপুরের পর থেকে অলিখিত ফতোয়াতে সব সিনেমা হল থেকে তুলে নেওয়া হল ছবিটি। পরিচালকের নাম অনিক দত্ত। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁর মন্তব্য 'অনুপ্রেরণা'কে ক্ষুব্ধ করেছিল। তারপর সিনেমায় আবার স্যাটায়ার, যায় কোথায়?

কিন্তু ভালো করে খেয়াল করুন, দলীয় লুম্পেন বাহিনীকে কোথাও নামানো হয়নি সিনেমা বন্ধ করার জন্য। রাজীব কুমারের কলকাতা পুলিসের বাহিনী নিঃশব্দে তা করে দিয়েছে। পতাকা হাতে তৃণমূলকে রাস্তায় নামানো হয়নি। পতাকা ছাড়াই পুলিশের ফতোয়ায় সিনেমা বন্ধ করতে বাধ্য হলো হল মালিকরা। ভিনরাজ্যের

জিগনেশ মাভানিদের কাছে অনুরোধ শুধু খালি চোখে দেখে সব বোঝার চেষ্টা করবেন না। দেশে গণতন্ত্রের অভাব বলে লড়ছেন নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সঙ্গে অনুপ্রেরণাকে নিয়ে। বস্তুনিষ্ঠভাবে ফের নিজের অবস্থান বিশ্লেষণ করুন। ভাবুন, আরও ভাবুন—অজান্তে সিস্টেমের হয়ে ভাড়া খেটে ফেলছেন কিনা।

পদ্মাবতের সেটে গেরুয়া ঝান্ডা নিয়ে বিক্ষোভে নামে এক দল মানুষ। ঠিক এই জায়গাতেই 'অনুপ্রেরণা'র কাছ থেকে প্রাইভেট টিউশন নিতে পারে গেরুয়া ঝান্ডাধারীরা। কী সুন্দর নীরব থেকে পুলিশ লেলিয়ে সিনেমা বন্ধ করে দেওয়া যায়। আর এস এসের সঙ্গে ফারাক খুঁজবেন 'অনুপ্রেরণা'র? ভাবতে থাকুন, তবে সময় কিন্তু স্থবির নয়।"

এর আগে ২০১৭ সালে ঠিক এইভাবেই নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে 'অনুপ্রেরণা'র নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস দখল নিয়েছিল প্রেস ক্লাব, কলকাতার। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যশালী প্রেস ক্লাব সেবারই প্রথম সরাসরি রাজনীতির গ্রাসে চলে গিয়েছিল। সরকারি নির্দেশে সভাপতি এবং সচিব পদে নমিনেশন ফাইল হয়েছিল সরকারের পদলেহনকারী এবং সুযোগসন্ধানী দুই সাংবাদিক স্নেহাশিস শূর এবং কিংশুক প্রামাণিক। তবে চক্রান্তের মূলে ছিলেন দুর্নীতির শিরোমণি সাংবাদিক বিশ্বনাথ মজুমদার। ফলে পাল্টা নমিনেশন জমা দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা সকলেই 'সুপারি কিলার'দের ফোন পেয়ে বাধ্য হয়েছিলেন নমিনেশন তুলে নিতে। ফলত সরকারি প্রার্থীরা বেসরকারি ক্লাবের দখল নিয়েছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পঞ্চায়েত ভোটে বিনা লড়াইতে জয়ের মতোই কৌশল করে। পরের বারেও ঘটে একই ঘটনা। চাপা সন্ত্রাস গ্রাস করেছিল গোটা প্রেস ক্লাবকে। হয়তো এবার আবার ঘটবে একই ঘটনা। হয়তো বা ২০২০ তেও। কারণ স্বৈরাচারের এ নমুনার সঙ্গে সুপারি কিলার রাজনীতির কোনও তফাত নেই। আমরাও কি নিঃশব্দেই মেনে নেব এ স্বৈরাচারিতা?

সাংবিধানিক হিসেব মতো, পশ্চিমবঙ্গে এখনও দুবছর ক্ষমতায় থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল। এই দুই বছরে তিনি আরও নৃশংস হবেন কারণ যতদিন যাবে, তিনি ততই ক্ষমতা হারানোর ইঙ্গিতগুলি পেতে থাকবেন। সুতরাং তিনি চাইবেন, মুগুর হাতে নিয়ে রাজ্য শাসন করতে। তার জন্য যতরকম অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়, তিনি করবেন। তার জন্য রাজ্যের যত ক্ষতি হয় তা করবেন এবং মানুষকে বোঝাতে চাইবেন—তিনিই একমাত্র নেতা। তাঁকে মেনে নিতে হবে সবাইকে। না মানলে—স্মরণ করতে হবে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পকে।

২০১১ ক্ষমতায় আসার ২/১ মাস আগের কথা। কথা হচ্ছিল এখনকার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনও তিনি ডক্টরেট হননি। তাঁকে যখন আগাম অভিনন্দন জানানো হলো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, উনি জোর করেই করমর্দনরত হাতটা সরিয়ে নিলেন। বললেন, 'কী মনে করছ তোমরা? আমি মুখ্যমন্ত্রী হব?' মমতা তখন রেলমন্ত্রী। আর নেতাদের পরবর্তী সারিতে তখন প্রথম মুখ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ধারণা ছিল—'আর কে? আপনি ছাড়া?' পার্থ চট্টোপাধ্যায় দুঃখের হাসি হেসে বলেছিলেন—''তোমরা আসলে মমতাকে চেন না। ও নিজে মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে আমায় ছেড়ে দেবে, একথা যদি তোমরা মনে কর, তাহলে বলব, মমতাকে চিনতে তোমাদের দেরি আছে।" পরে দেখা গেল, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেদিন ঠিকই বলেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সত্যিই আমরা চিনিনি। যেমন চিনতে পারেনি গোটা রাজ্যবাসীই। যদি চিনত, তাহলে মমতার পক্ষে জীবনেও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিল না।

কথায় বলে, One stich in time, saves nine। এখনও সময় আছে। দেশবাসী চিনেছেন মমতাকে। রাজ্যের বাইরে পা রাখলে জনতার কথোপকথনে তা পরিষ্কার। চিনেছেন রাজ্যবাসীও। তবে সকলে নয়। এখনও একটা অংশ মমতা মোহে ভুগছেন। আর সক্রিয় হচ্ছে ভৈরব বাহিনী যারা ভোটের সময় স্বরূপ নিয়ে ময়দানে ঝাঁপায় রাজ্যটাকে বিরোধীশূন্য করার লক্ষ্যে। যদি তা তারা করতে পারে, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাবে, ভারত ফের বিভাজিত হবে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বুঝবেন তাঁর আর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবে না, তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন 'বিশ্ববাংলা' লোগো হাতে নিয়ে, সেদিন তলিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। সুতরাং মোহমুক্ত হবার সময় এসে গেছে। সময় এসে গেছে পশ্চিমবঙ্গকে মমতা এবং মমতা-বাহিনী মুক্ত করার। যা ক্ষতি হবার হয়েছে। এ ক্ষতি অপূরণীয় হলেও মেনে নিতে হবে। কিন্তু পুনরায় ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না। শুকনো ছারপোকা ভয়াবহ। এদের সমূলে বিনাশই একমাত্র পথ।

ইতিমধ্যেই মাত্র ৭ বছরের মধ্যেই রাজ্যের সংস্কৃতি, মূল্যবোধকে সমূলে উৎপাটন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল। পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হয়েছে লুটেরার রাজ্যে। নারী নির্যাতনের মাত্রায় দেশের মধ্যে সর্বশীর্ষে নাম পশ্চিমবঙ্গের। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ সেরা। বন্ধ কল-কারখানার মাত্রায় এরাজ্য সবার ওপরে। নারীশিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী। সাম্প্রদায়িকতা এরাজ্যে সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি ঋণের বোঝা পশ্চিমবঙ্গেরই মাথায়। অথচ সার্কাস আর মেলার কোনো খামতি নেই। সেখানে সবার ওপরে পশ্চিমবঙ্গ। খাও দাও মজা লোটো ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। গ্রামে গ্রামে মদের দোকান গড়ে দেওয়া হয়েছে। যত পার গেলো।

ভাবার সময় এসেছে। আর অপেক্ষা নয়। বৃথা কালক্ষেপ সর্বনাশকেই ত্বরান্বিত করে। অতএব প্রস্তুত হতে হবে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবাদের দুর্গ। প্রতিবাদের ঝড় তুলতে হবে। স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যা ভেঙে দেবে অন্যায় আর অপশাসনের সব বাঁধ। সময় আগতপ্রায়। শত্রু আর বন্ধুকে চিনে নেওলয়ার। ভুল সিদ্ধান্ত ধ্বংসের আগামনী বার্তা বয়ে আসবে। সঠিক সিদ্ধান্তই সুর তুলবে নতুন আগমনী বার্তায়—সে বার্তা দেশ গঠনের, দেশ উন্নয়নের। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের উত্থানবাণীতে ঘোষিত হোক নতুন ভারতের জয়যাত্রা।

■

বাঙ্গালি হিন্দুর ‘নিজস্ব মাতৃভাষা দিবস’ কেন প্রয়োজন

জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জী

অধিকারের লড়াই বা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্দোলন পৃথিবীর অনেক জায়গায় দেখা গেলেও মাতৃদুগ্ধ সমান মাতৃভাষার জন্য লড়াই খুব কম জায়গায় দেখা গেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন দেখা গিয়েছিল অসমের বারাক উপত্যকায়। যে আন্দোলনটি ১৯৫২ সালের পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া ভাষা আন্দোলনের থেকে অনেক বৃহত্তর এবং মর্মান্তিক। কিন্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন সরকার এটিকে চেপে রেখেছিল এবং যুব সমাজের থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

কী ঘটেছিল ১৯৬১ সালের ১৯ মে দিনটিতে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য এবং মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে ১১ জন বাঙ্গালি হিন্দু প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? কী এমন ঘটনা ঘটল যার জন্য তাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো। এই ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৮৭৪ সালে, যখন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাঙ্গালি অধ্যুষিত দুটি জেলা সিলেট এবং কাছাড়কে বেঙ্গল প্রভিন্স থেকে আলাদা করে অসমের মধ্য অন্তর্ভুক্ত করে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে সিলেট গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের একটি বড়ো অংশ পূর্বপাকিস্তানে চলে যায়। বাকি অংশ ভারতের অসম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় যেটি বাঙ্গালি অধ্যুষিত বারাক উপত্যকা নামে পরিচিত। এই বারাক উপত্যকা মূলত তিনটি জেলা হাইলাকান্দি, কাছাড় এবং করিমগঞ্জ নিয়ে গঠিত। উল্লেখ্য এই তিনটি জেলা হলো বাঙ্গালি অধ্যুষিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষের মধ্যে সিলেটকে অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করে। কিন্তু মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িকতার কাছে অবশেষে হেরে যায়। অতঃপর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে বারাক উপত্যকায় বসবাস শুরু করে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বারাক উপত্যকার বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধিকার নিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু মূল ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অঙ্গুলিহেলনে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৬০ বিধানসভায় পাশ করে, যেটির মূল বিষয়বস্তু ছিল অসমের রাজ্য সরকারি ভাষা হিসেবে শুধুমাত্র অসমীয়কে অন্তর্ভুক্ত করা।

কিন্তু সেখানে বসবাসরত অসমীয় সমাজও এই বিলটির বিরোধিতা করেছিল বারাক উপত্যকায় বসবাসকারী বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। অতঃপর বারাক উপত্যকার বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ বিভিন্ন জায়গায় বিরোধ প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু তদানীন্তন অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমল প্রসাদ চালিহার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সেই আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি।

ফলে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষায় অধিকারের জন্য ১৯৬১ সালে ১৯ মে হরতালের ডাক দেয়। হরতালের শুরুটা ভালোভাবেই হয়েছিল কিন্তু বিকেল গড়াতেই পুলিশ যখন সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে তখন সত্যাগ্রহীরা আন্দোলন জোরদার করে। সেই সময় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই ন’ জন সত্যাগ্রহী শহিদ হন এবং পরে আরও দুইজন সত্যাগ্রহী শহিদ হন। যার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। শিলচরের রাজপথ রঞ্জিত হয়ে যায় কানাইলাল নিয়োগী, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, কমলা ভট্টাচার্য সহ ১১ জনের রক্তে।

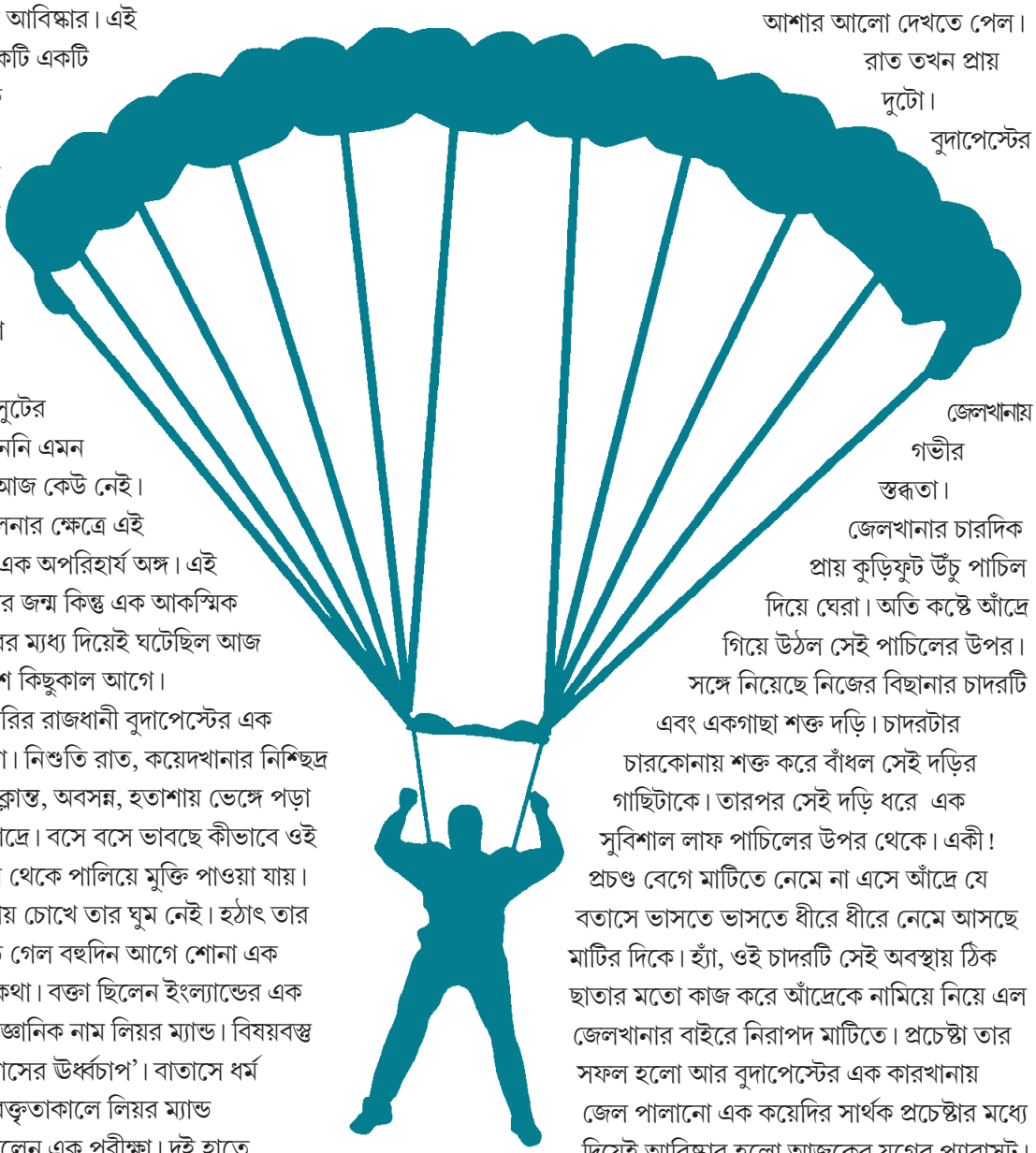
এরপর কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রীয় নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে এবং শাস্ত্রী কমিটির পরামর্শে বাংলাকে অসমের রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে ভাষার জন্য প্রাণ বলিদান দেওয়া একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং কলঙ্কজনক অধ্যায়। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে যখন কোনো জাতির ওপর সরকারি দমন পীড়ন হয় তখনই বিচ্ছিন্নতাবাদীর জন্ম হয়। কিন্তু ১৯৬১ সালের বাংলাভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা বিচ্ছিন্নবাদের পথ বেছে নেয়নি বা তারা ভারতবর্ষ থেকে নিজেদের আলাদা করেনি, বরং তারা এই মাটির মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালিয়ে তাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে পরোক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করতে চেয়েছিল, সেই দুরভিসন্ধি সম্ভব হয়নি। কারণ বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ এই দেশকে নিজের মায়ের মতো মনে করে পূজা করে থাকে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির কথা বিশ্ব জুড়ে স্মরণ করা হলেও ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র শহিদদের কথা কেউই মনে রাখেনি। তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে কোনো জাতির মর্যাদা বিশ্বের বুকে স্থাপন করার জন্য সেই জাতির বুদ্ধিজীবী সমাজ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখানকার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ কংগ্রেস সরকারের মাধ্যমে সুযোগসুবিধা ভোগ করে ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র ঘটনাকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কতকগুলি কলঙ্কজনক ঘটনার মধ্যে ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র ঘটনাও একটি জায়গা দখল করে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে যার অঙ্গুলিহেলনে শিলচরের রাজপথ বাঙ্গালি হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেই জওহরলাল নেহরুকে আধুনিক ভারতের রূপকার আখ্যা দিয়েছেন তথাকথিত আধুনিক বাঙ্গালি নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। অবশ্য মমতা ব্যানার্জি এসব বলবেনেই কারণ, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ উত্তরবঙ্গের দাড়িভিট হাইস্কুলে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র রাজেশ-তাপসের রক্তে রঞ্জিত করে জওহরলাল নেহরুর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ■

চিত্তাকর্ষক আকস্মিক আবিষ্কার

আবিষ্কার আবার আকস্মিক হবে কী ভাবে? হ্যাঁ, তাই হয়। পৃথিবীর বহু আবিষ্কারই ঘটেছে আকস্মিক ভাবে কোনো না কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে। বহু তুচ্ছ আকস্মিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীরা বহু সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজানিক সত্যের সমধান পেয়ে থাকেন। ফলে ঘটে যায় মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই রকমই একটি একটি চিত্তাকর্ষক আকস্মিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা আজ আলোচনা করব।



প্যারাসুটের নাম শোনেনি এমন মনে হয় আজ কেউ নেই। বিমান চালনার ক্ষেত্রে এই প্যারাসুট এক অপরিহার্য অঙ্গ। এই প্যারাসুটের জন্ম কিন্তু এক আকস্মিক আবিষ্কারের ম্যধ্য দিয়েই ঘটেছিল আজ থেকে বেশ কিছুকাল আগে।

হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের এক কয়েদখানা। নিশুতি রাত, কয়েদখানার নিশ্ছিদ্র এক ঘরে ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশায় ভেঙ্গে পড়া কয়েদি আঁদ্রে। বসে বসে ভাবছে কীভাবে ওই বন্দিজীবন থেকে পালিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। সেই চিন্তায় চোখে তার ঘুম নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে শোনা এক বক্তৃতার কথা। বক্তা ছিলেন ইংল্যান্ডের এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নাম লিয়র ম্যান্ড। বিষয়বস্তু ছিল 'বাতাসের ঊর্ধ্বচাপ'। বাতাসে ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতাকালে লিয়র ম্যান্ড দেখিয়েছিলেন এক পরীক্ষা। দুই হাতে দুই মজবুত ছাতা ধরে লাফিয়ে পড়ে তিনি সেদিন দেখিয়েছিলেন ছাতার ভিতর দিকের কাপড়ে ঊর্ধ্বচাপ হেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হ্রাস পেয়ে কেমন ভাবে সহজে নিরাপদে মাটিতে নেমে আসা সম্ভব হয়। সেই পরীক্ষাটি আঁদ্রের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই ঘটনার কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে যেন বিশাল অন্ধাকারের ম্যধ্য আশার আলো দেখতে পেল। রাত তখন প্রায় দুটো। বুদাপেস্টের জেলখানায় গভীর স্তব্ধতা। জেলখানার চারদিক প্রায় কুড়িফুট উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। অতি কষ্টে আঁদ্রে গিয়ে উঠল সেই পাচিলের উপর। সঙ্গে নিয়েছে নিজের বিছানার চাদরটি এবং একগাছা শক্ত দড়ি। চাদরটার চারকোনায় শক্ত করে বাঁধল সেই দড়ির গাছিটাকে। তারপর সেই দড়ি ধরে এক সুবিশাল লাফ পাচিলের উপর থেকে। একী! প্রচণ্ড বেগে মাটিতে নেমে না এসে আঁদ্রে যে বতাসে ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে মাটির দিকে। হ্যাঁ, ওই চাদরটি সেই অবস্থায় ঠিক ছাতার মতো কাজ করে আঁদ্রেকে নামিয়ে নিয়ে এল জেলখানার বাইরে নিরাপদ মাটিতে। প্রচেষ্টা তার সফল হলো আর বুদাপেস্টের এক কারখানায় জেল পালানো এক কয়েদির সার্থক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই আবিষ্কার হলো আজকের যুগের প্যারাসুট।

—**বিশ্বজিৎ সাহা**

ভারতের পথে পথে

দ্বারকা



গুজরাটের দ্বারকা ভারতের অতি পবিত্র তীর্থ। সপ্তপুরীর এক পুরী দ্বারকা। অতীতকালের দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গের সংস্কার করে গোমতা নদীর তীরে । যদুবংশের নতুন রাজধানী গড়েন শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রপ্রস্থের পরেই সেযুগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জনাকীর্ণ নগর ছিল দ্বারকা। অতীতের সেই দ্বারকা এক সময় সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে সমুদ্রগর্ভে সেই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। বর্তমান দ্বারকা নগরী গড়েন ১৯ শতকে গায়কোয়াড়ের রাজা। এখানকার মূল আকর্ষণ দ্বারকাধীশ বা রণছোড়রজীর মন্দির। গোমতার অপর পারে রয়েছে কৃষ্ণ মন্দির, পঞ্চনদ তীর্থ। রয়েছে রুক্মিণী মন্দির, একান্ন পীঠের এক পীঠ ভদ্রকালী মন্দির, সারদা মঠ। একটু দূরে জ্যোতির্লিঙ্গ নাগেশ্বর, মীরাবাঈয়ের মন্দির।

জানো কি?

ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধ্যেয়বাক্য

- NCERT, BHU, IISER —বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।
- Indian Statistical Institute —ভিন্নৈক্যস্য দর্শনম্।
- IIM ব্যাঙ্গালুরু— তেজস্বিনাবধীতমস্তু।
- IIM আমেদাবাদ— বিদ্যা বিনিয়োগাৎ বিকাশঃ।
- JNU— প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।
- DU —নিষ্ঠা ধৃতিঃ সত্যম্।

ভালো কথা

আমার দীঘা ভ্রমণ

গত ২৫ জানুয়ারি সকালে আমি, বাবা,মা,ভাই, জেঠু,জেঠিমা ও আমার জেঠতুতো ভাই সান সবাই মিলে দীঘা গিয়েছিলাম। সেখানে 'অতিথি' হোটেলে উঠেছিলাম। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করেছি। সকালে সমুদ্রের ধারে ছোটো ছোটো গর্তে লাল কাঁকড়া দেখলাম। মানুষ দেখলেই সেগুলি খুব তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। পরদিন সায়েন্স মিউজিয়ামে বেশ কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। আর ভুলভুলাইয়াতে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। পুরাতন দীঘাতে অনেক কিছু কিনেছি। তালসারিতে নদীতে আমরা নেমেছিলাম। সেখানে সুবর্ণরেখা নদী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। সেখানেও লাল কাঁকড়া দেখলাম। চন্দনেশ্বর মন্দির খুব ভালো লাগলো। সেখানে একটা ষাঁড় হঠাৎ এসে শিবঠাকুরের মালা খেয়ে নিল। দীঘাতে আমাদের খুব ভালো লাগলো। দুদিন থেকে সবাই তমলুকে ফিরে এলাম।

আরাত্রিকা মিশ্র, দ্বিতীয় শ্রেণী, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক্ষি ত শি উ	(১) র ক ন ব গৌ অ জ
(২) তি ই বা ক	(২) ত্মী জ রি আ য় প ন

১৮ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) সন্ধ্যাপ্রদীপ (২) চড়ুইভাতি

১৮ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) স্থাপত্যকৌশল (২) স্বভাবনিন্দুক

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (২) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (৩) আদৃতা দলই, চৈতন্যপুর, সুতাহাটা, পূঃ মেদিনীপুর। (৪) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

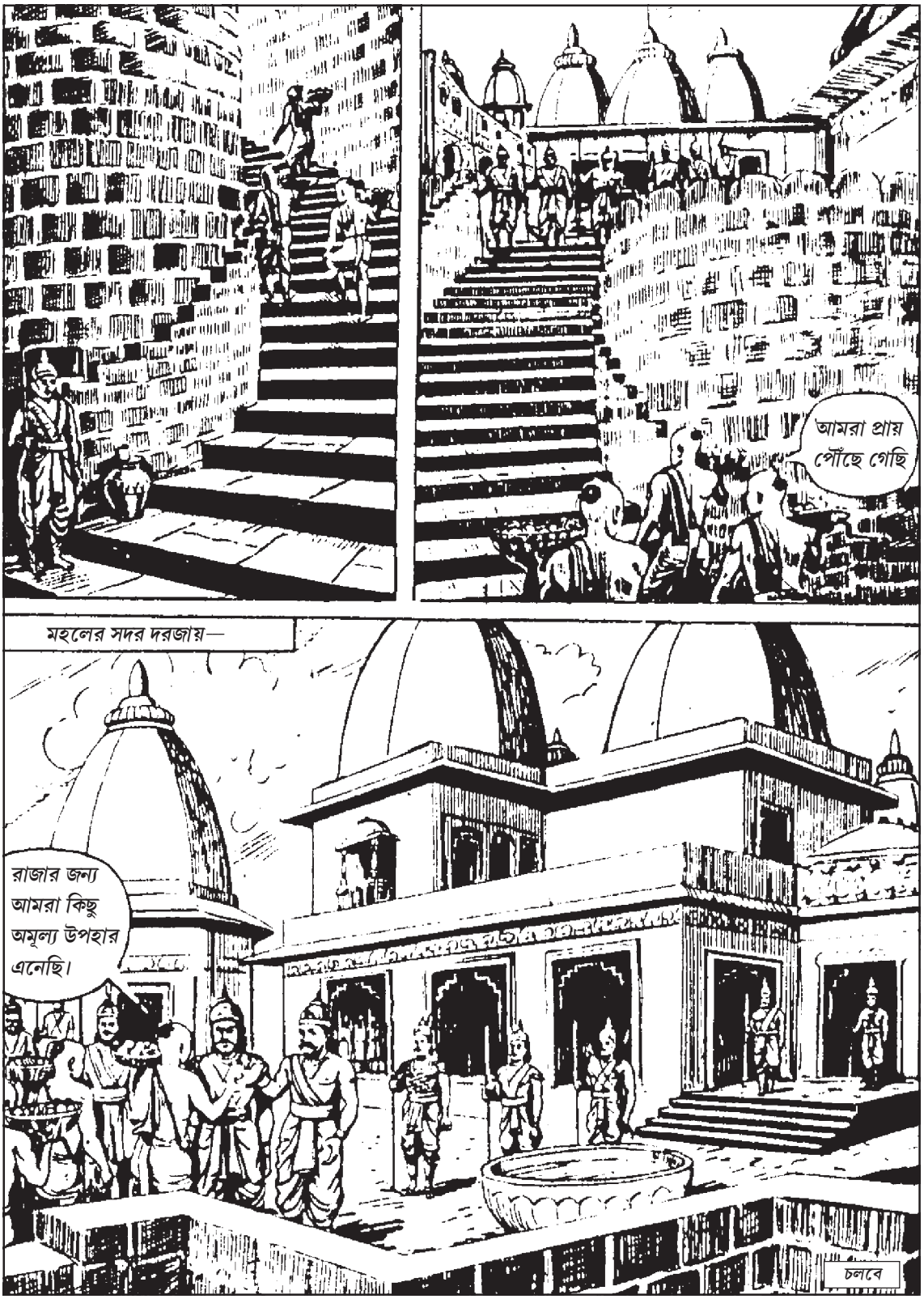
নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১৬।।



চলচ্চিত্র, সমাজ ও একটি আহ্বান



দাদাসাহেব ফালকে

বিতান কিশোর পাল

ভারতীয় চলচ্চিত্র ১০০ বছর অতিবাহিত করল। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'-এর (১৯১৩) পর থেকে ১০৫ বছরের যাত্রা প্রায়। এই দীর্ঘ সময়কালে সিনেমার সব থেকে বড়ো প্রাপ্তি বিপুল জনপ্রিয়তা। পাইরেটেড কপির রমরমা আপাত ভাবে ব্যবসায়িক ক্ষতি করলেও চলচ্চিত্রকে আরও জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। আগে সিনেমাহলের সংখ্যা কম ছিল, ছিল না ইন্টারনেটও। বর্তমানে সিনেমা বিনোদন ভারতবাসীর 'মৌলিক অধিকার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম ইন্ডাস্ট্রি এখন সেন্সরশিপ, বাকস্বাধীনতা, নারী-পুরুষের আলাদা পারিশ্রমিক, পৈত্রিক স্টারডম, #metoo ইত্যাদিতে সরগরম। কিন্তু জনসাধারণের উপর সিনেমার প্রভাব নিয়ে আমরা আশ্চর্যজনকভাবে চুপ। হিট ফিল্মের নায়ক-নায়িকার পোশাকের অনুকরণে বাজার ছেয়ে যায়। বালক-তরুণদের মুখে মুখে সেই চলচ্চিত্রের বুলি। শৈশবের সারল্য বা ছেলেখেলা বলে অনেকেই দাবি করেন। কিন্তু বাস্তবে এগুলিই ভবিষ্যতের সমাজ, নৈতিকতা, মনন গঠন করছে। একটা সিনেমা একজনের কথা, জীবনদর্শন, পছন্দ-অপছন্দে বিপুল প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ধরে। এখন সিনেমা ও সিরিয়াল, বইকে প্রায় বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। ফলত সিনেমা শুধু নিটোল বিনোদনের বাইরে এক বিশাল সামাজিক দায়বদ্ধতার অধিকারীও, সেটা নিয়ে ছেলেখেলাকরা উচিত নয়।

সিনেমা, সিরিয়াল, গান ইত্যাদি বিনোদনমাধ্যম বর্তমানে সমাজকে অনেক সুস্থ ও নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার ক্ষমতায় বলিয়ান। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনপ্রিয়, বাণিজ্যিক সাফল্যপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতাদের কাছে কেবল পণ্য মাত্র। সামাজিক দায়বদ্ধতা বা নৈতিকতার এমনকী শৈল্পিক মানের লেশমাত্র উপস্থিতি নেই। এক ভ্রমাত্মক, মেকি ও ভ্রান্ত সমাজ গড়ার যজ্ঞে ব্যস্ত। বালক-তরুণদের ভুল পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য অগ্রণী। চারপাশে দেখলে উদাহরণের অভাব নেই। এটা প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতাদের, চলচ্চিত্র শিল্পের নিন্দনীয় ব্যবহার। আবার আমারই সব জেনেও এঁদের অপরিমিত সম্মান দিই। এদের 'বুদ্ধিজীবী' 'জ্ঞানী' বলে সম্মান করি।

কিন্তু কেন? কেন এত সম্মানের ঘনঘটা? কারণ তারা সাধারণ মানুষের মন ও সেন্টিমেন্ট নিয়ে ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন, তাই?

আবার আমাদেরই একাংশ এই সিনেমা দেখেন না বলে গর্ব ও অহং বোধ করেন। আমরা ভুলে যাচ্ছি, যে-বোধি আমাদের এগুলো বর্জন করতে শিখিয়েছে, সেটাই আমাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও দিয়েছে। এবং সর্বোপরি আমারাও এই সমাজেরই অঙ্গ। এ সমস্তকে এড়িয়ে কি আমরা ওই ব্যবসায়ীদের থেকে ভালো মানুষ হচ্ছি? আমাদের ভূমিকা ও অবদান কি ঠিক? যখন আমাদের সমাজের সিংহভাগ এই অনৈতিকতার শিকার এবং এক ভ্রান্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে?



প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র 'হরিশ্চন্দ্র'।

অন্য রকম

ছ'বার গিনেসে নাম কিরণ উনিয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিনি ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর কর্নেলের স্ত্রী। সম্মান, গর্ব, পরিচিতি কোনওটাই তার অভাব নেই। তবু তিনি নিজের পরিচয়ে আজ অনন্যা হয়ে উঠেছেন। মার্শাল আর্টসে নজিরবিহীন দক্ষতার জন্য ছ'বার গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলে ফেলেছেন কিরণ উনিয়াল।



স্বামী সুনীলের সঙ্গে কিরণ।

সেনা অফিসারের স্ত্রী, দুই সন্তানের এই মা 'ফুল কনটাক্ট এলবো স্ট্রাইক' (এক হাতে) মাত্র ৩ মিনিটে প্রতিপক্ষকে ৪৬৬ বার আঘাত করে নয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে ফেলেছেন। এই সম্মান তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত মেয়েদের উৎসর্গ করেছেন। এই সূত্রে এই নিয়ে ষষ্ঠবার নিজের নাম তুলে ফেলেছেন গিনেস বুকে। এ পর্যন্ত কিরণের ঝুলিতে রয়েছে মার্শাল আর্টের ১১টি বিশ্ব রেকর্ড। এর মধ্যে মার্শাল আর্টস, ফিটনেস এবং সামাজিক কাজের জন্য ৬ বার নিজের নাম গিনেস বুকে লিপিবদ্ধ করেছেন কিরণ। ভারতীয় সেনা এবং আধা সেনা পরিবারের মধ্যে কিরণ উনিয়ালই প্রথম মহিলা যিনি ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জেরে গিনেস বুকে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

তার স্বামী সুনীল উনিয়াল দেশের সুরক্ষায়। তাই বহুদিন ধরেই মার্শাল আর্টসকে ধ্যান-জ্ঞান করে ফেলেছেন ব্রুস লি-র এই অন্ধ ভক্ত। তার কথায়, 'কৈশোর বয়স থেকে আমি ব্রুস লি-র অন্ধ ভক্ত। ব্রুস লিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই ছোটো বয়সে তাইকোন্ডো শেখা শুরু করি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর পিছনে ফিরে তাকাইনি। এখনও সমান তালে নিজে প্র্যাকটিস করি এবং মেয়েদের শেখাই।' বস্তুত, এই অধ্যবসায়ই তাকে পৌঁছে দিয়েছে দক্ষতা তথা খ্যাতির শিখরে। দেশের সুরক্ষায় গর্বিত এক ব্যক্তিত্ব যদি হন সুনীল উনিয়াল, তা হলে তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়ন কিরণ হলেন মাতৃশক্তির অপর এক নাম। তার বক্তব্য, 'সমাজ হোক বা দেশ— সকলের ভালো করতে হলে সবচেয়ে জরুরি দুষ্টের দমন। আর সেই কারণেই জরুরি নিজেকে প্রস্তুত করা।'

ছোটোবেলা থেকেই মার্শাল আর্টস শিখছেন কিরণ। এখন মেয়েদের আত্মরক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাইকোন্ডো শেখান তিনি। সিকন্দরাবাদের মিলিটারি স্টেশনে কর্মরত সুনীল উনিয়ালের স্ত্রী কিরণের সংগ্রহে এখনও পর্যন্ত এগারোটি বিশ্বরেকর্ড। এখানেই শেষ নয়, উনিয়াল দম্পতি মিলে সেনাবাহিনীতে কর্মরতদের যে সব সন্তান বিশেষ ভাবে সক্ষম, তাদের জন্য একটি বইও লিখেছেন। বইটির নাম 'এমপাওয়ারিং দিব্যজ্ঞান : এ কম্পেনডিয়াম অব বেনেফিটস অ্যান্ড ফেসিলিটিস ফর দ্য ডিফারেন্টলি এবেইলড চিল্ডরেন অব দ্য আর্মড ফোর্সেস'।

সুনীল নিজেও দূরপাল্লার (ম্যারাথন) দৌড়বিদ। ফিটনেস এবং সমাজসৃজনের জন্য কিরণ এবং সুনীল দু'জনেই পেয়েছেন সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি। তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। যে বিশেষ ভাবে শারীরিক সক্ষম। কিরণ ও সুনীল বলেছেন, 'এই ধরনের শিশুদের বড়ো করে তোলাটা এমনিতেই একটা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এই ধরনের অভিভাবক সেনাবাহিনীতে থাকলে গোটা পরিবারের কাছে তা আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। শহিদ পরিবারের সন্তানদের জন্যেও কাজ করেন কিরণ। শহিদদের স্ত্রী-দের কীভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করাবেন, সেই কাজেও ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন কিরণ। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুলওয়ামার জঙ্গি হামলায় ৪৪ জন জওয়ানের মৃত্যু ঘিরে গোটা দেশ যখন উত্তাল, ক্ষোভ-বিক্ষোভ যখন রাগ প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে, তখন নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন কিরণ। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, শক্তি ছাড়া লড়াই করা সম্ভব নয়। কিরণের কথায়, 'সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এমন একটা পেশা, যেখানে গোটা পরিবারের তরফ থেকে মানসিক সাহায্য, মনের জোর খুব জরুরি। তার জন্য চাই শক্তি। কঠিন অধ্যবসায়। আর সেটা তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে।'

২০১৯ লোকসভা নির্বাচন এবং মমতার দ্বিচারিতা

ডাঃ আর দাস

প্রথমেই আসি অল্প কিছু মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচন তালিকায়। বীরভূমের শতাব্দী রায়, বারাসতের কাকলি ঘোষদস্তিদার, যাদবপুরের মিমি চক্রবর্তী, আসানসোলে মুনমুন সেন, বসিরহাটে নুসরত জাহান, মালদহে মৌসম নূর, আরামবাগের অপরূপা পোদ্দার যিনি মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে নাম নিয়েছেন আফরিন আলি। কিন্তু হিন্দু ভোটারদের ঠকানো সহজ। তাই অপরূপা পোদ্দার নাম নিয়ে তপশিলি জাতির কোটায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঠিক ফিরোজ খানের লন্ডনে নিকা করা মাইমুনা বেগম অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর মতো নাম ভাঁড়িয়ে নির্বাচনে নামবেন, এই আরকি! আর একজন হচ্ছেন, বনগাঁর মমতাবালা ঠাকুর।

আমার তো মনে হয় অনেক প্রার্থীই আসলে ধর্মান্তরিত মুসলমান অথবা খ্রিস্টান কিন্তু হিন্দুদের বোকা বানিয়ে, তাদের দেশে তাদের টাকা লুট করে, তাদেরই শাসন ও শোষণ চালানোর এ এক অত্যন্ত সহজ অথচ নির্ভুল উপায়। তাই পূর্বের হিন্দু নামই ব্যবহার করেন! তাই না? কি ভুল বললাম! মনে করিয়ে দিচ্ছি, হিন্দু নামধারী অথচ ঘোর-হিন্দু বিদ্বেষী খ্রিস্টান কেরলের মিস অরুন্ধতী রায় আর তামিলনাড়ুর প্রয়াত ডি এম কে নেতা এম করুণানিধির কথা।

হিন্দুরা সব কিছু জেনেও কিছু করতে সাহস পায় না। এছাড়া উপায় কী আছে বলুন অসহায় হিন্দুদের? ধর্ষণের হুমকি, পিঠে এবং পেটে মারবে তৃণমূলের গুন্ডারা যারা বেশিরভাগই হবে ষণ্ডামার্কা মুসলমান।



আপনিও তো তাদের চেনেন? যে কোনো রিক্‌শা, অটো বা বাসস্ট্যান্ডে যান। দেখবেন আপনার জন্য অপেক্ষারত চালক অথবা হেল্পাররা। হ্যাঁ, তারাই হচ্ছেন মমতার পোশাকহীন সৈন্যবাহিনী। এরা আগে সিপিএমের ভাড়া খাটতো। 'জামানা বাদলা', তো তারাও তাদের আনুগত্য পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে! নয়তো কেস খেয়ে যাবে যে!

লোকসভার প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে পার্লামেন্টে যাবেন এবং সেখানে স্থানীয় বসবাসকারীদের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরবেন, বিতর্কে অংশ নেবেন, প্রশ্ন করবেন— এসবই তাদের দায়িত্ব। কিন্তু জানেন কি গত পাঁচ বছরে পার্লামেন্টে চিত্রাভিনেত্রী মুনমুন সেন মাত্র ১টি বিতর্কে অংশ নিয়ে প্রতি বছর ১৮ লক্ষ টাকা বেতন নিতেন। ঠিক সেরকমই বীরভূমের বহুচর্চিত রুপালি পর্দার নায়িকা শতাব্দী রায় যিনি মাত্র ২টি প্রশ্ন এবং ৪টি আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং ১৮ লক্ষ টাকা প্রতি বছর ঘরে তুলতেন। এটাও এক ধরনের লুট যার শুরু হয় ৭০০ বছর আগে মুসলমান শাসন থেকে। মুসলমান আর ইংরেজ শাসন শেষ হলে, আশা ছিল এবার হয়তো পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে! কিন্তু হায়রে বিধাতা! যাই হোক, সবথেকে বেশি ১০টি প্রশ্ন করেছিলেন আর ৪ বার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন কাকলি ঘোষদস্তিদার। সবার মনে আছে, ২০১১ সালের পার্কস্ট্রিটে আংলো-ইন্ডিয়ান 'সুজেটে'র রেপকেসে উনি কী বলেছিলেন? তাঁর কাছে 'সুজেট' ছিল নষ্ট মেয়েছেলে। 'তাই সেটাকে ঠিক রেপ বলা অনুচিত হবে!'

আসলে সংসদের বিতর্কে ভাগ নিতে হলে রীতিমতো পড়াশুনা করে, নিজেকে তৈরি করে সম্মাননীয় সাংসদদের সামনে নিজেকে পরীক্ষা দিতে হয়। তার জন্য চাই জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি আর স্থানীয় মানুষদের জন্য আর্ত আকুতি। সেসবের কোনো বালাই নেই



ফঃ ৬

এঁদের মধ্যে। এ ব্যাপারে পুরানো কংগ্রেসিরা আর বামপন্থীরা তৃণমূলিদের থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত এবং বাকপটু সাংসদদের আমদানি করতে পেরেছিল। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট আর বিজেপি সাংসদদের তবুও একটা নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, কিন্তু তৃণমূলিদের একটাই আদর্শ ছিল তা হলো, 'বামপন্থীদের বঙ্গমুক্ত করে নিজেরা ভোগ দখল করবে'। বেআইনি ভাবে সত্তা দখল করে যেনতেনপ্রকারেণ, গায়ের জোরে গুন্ডামি করে, খুন করে, নারীধর্ষণ করে, সিন্ডিকেটরাজ চালু করে, চিটফান্ডের ব্যবসা ফেঁদে, হিন্দু বাঙ্গালির অস্মিতা, ভাষা, পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা এবং দেশের সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের পার্টির পোষা গুন্ডাদের পকেট ভরানো ছাড়া আর কী করেছেন উনি? ঠিক লালু অ্যান্ড কোম্পানি, মুলায়ম, করুণানিধি, চন্দ্রবাবু নাইডু, চন্দ্রশেখর রাও— এঁরা সবাই সেই একই 'পরিবারবাদ আর সংকীর্ণ স্বার্থপরতার' উপর কখনও উঠতে পারেননি। তাই তাদের সকলের মিলিত এক অশুভ 'মহাগঠবন্ধন' হতে চলেছে আগামী ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে!

এবার আসি মুসলমান অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী বসিরহাট নির্বাচন কেন্দ্রের কথায়। সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে রুপালি পর্যার নায়িকা নুসরাত জাহানকে। এই সেই নায়িকা যার দোস্ত কাদের খান, ২০১১ সালে 'সুজেট'কে মধ্যরাত্রে গাড়িতে তুলে পাঁচজন মিলে গ্যাংরেপ করেছিল এবং তার অচেতন ও ক্ষতবিক্ষত দেহ রাস্তায় ফেলে চলে গিয়েছিল। এই সেই নুসরাত যিনি 'কাদের খান'কে দুবাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেসময় কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার দময়ন্তী সেন অপরাধীদের ধরেও ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তারা তৃণমূলের লোক। তাই শাস্তি হিসাবে তাকে ডিমোশন করে বদলি করা হলো। কার অঙ্গুলি হেলনে? এই হলো মা-মাটি-মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আসল চেহারা!

মমতা ভালোই বুঝতে পারছেন যে এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ভালোই ফল করবে তাই বেছে বেছে প্রার্থীও তৈরি করেছেন অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি হিন্দু প্রধান এলাকায় মোদী লহর দেখা গেছে ভালোই।

যেখানে হিন্দুর আধিক্য বেশি যেমন মেদিনীপুর (৮৮%), পুরুলিয়া (৯২%), কুচবিহার (৭২%), রানাঘাট (৮৩%), জলপাইগুড়ি (৭৬.৫%), দার্জিলিং (৬৭%), রায়গঞ্জ (৪৬%), ঝাড়গ্রাম (৯২%), আসানসোল (৮২%), এবং বাঁকুড়াতে (৯৪%), সেসব জায়গায় পুরানো কংগ্রেসি বা বর্ষীয়ান দলত্যাগী বামপন্থী নেতাদের দিয়ে সহজ-সরল অসহায় হিন্দুদের ভোট কবজা করা! এখনও সময় আছে! পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপি-কে ভোট দেয় তবে অনায়াসে ৩২টি আসন পেয়ে যাবে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন হবে আর রাজ্য এন আর সি চালু হয়ে গেলে 'ভোটব্যাঙ্ক' পলিসির সমাপ্তি হবে! কিন্তু মমতা- কংগ্রেস-সিপিএম তলায় তলায় ঠিক করে রেখেছে যাতে নির্বাচনের ফল 'হাং' হয় অর্থাৎ কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গড়তে না পারে!

উত্তর এবং দক্ষিণ মালদহে অহিন্দু ভোটের সংখ্যা অনেক গুণ বেশি। সেখানে কি হিন্দু প্রার্থী মুসলমানদের ভোট আশা করতে পারেন? তাই মমতা গনি খানচৌধুরীর বোনঝি কংগ্রেসের দলত্যাগী মৌসুম বেনজির নূর আর ডাঃ মোয়াজ্জম হোসেনকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁরা অনেক আশা পূর্ণ করবেন পিসির! কুচবিহারে হিন্দু ভোটারের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং বিজেপির জেতার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তাই, মমতা, মেখলিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত তিন বারের এম এল এ পরেশ অধিকারী যিনি আগে ফরওয়ার্ড ব্লক করতেন এবং বুদ্ধবাবুর ক্যাবিনেট মন্ত্রীও হয়েছিলেন, তাকে দাঁড় করাচ্ছেন। যদিও এই ধূর্ত ব্যক্তিটির স্বজনপোষণ সবার জানা। মমতার মন্ত্রী হওয়ার পরের দিনই নিজের মেয়ের স্কুল-শিক্ষিকার চাকরিটি পাকা করিয়ে নেন।

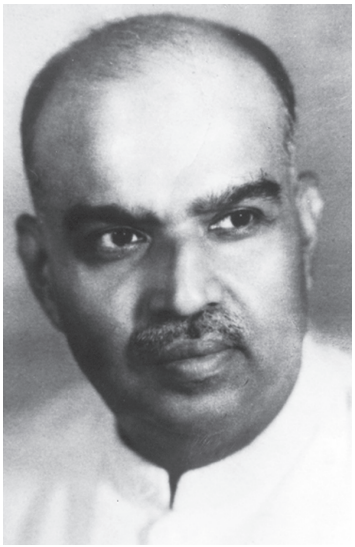
নদীয়া জেলার রানাঘাট নির্বাচন ক্ষেত্রে মহিলাপ্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে রেখেছেন যাতে করে হিন্দু ভোটাররা সাহস পান। এই সেই রানাঘাট যেখানে চার্চের বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীকারীরা রেপ করে পালিয়ে গেলে কৃষ্ণনগরের পুলিশ কমিশনার মমতার আদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে হিন্দু যুবকদের গ্রেপ্তার করেন।

শেষ করি অপরূপা পোদ্দারের কথা দিয়ে। আরামবাগ! হ্যাঁ সেই আরামবাগ যেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, মা সারদামণি আর হিন্দুধর্মের প্রখর প্রবক্তা বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত আরামবাগ। আজ অবশ্য সবাই আরামবাগের হ্যাচারির কথাই বেশি জানে!

যাক সে কথা! অপরূপা পোদ্দার তপশিলি কোটায় ২০১৪ সালে এই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ হয়েছিলেন। তারপর ডিভোর্স দিয়ে শিখর আলির সঙ্গে নিকে করে নাম রাখেন 'আফরিন আলি'। তিনি বলছেন, 'ধর্ম বদল করিনি'। কিন্তু নামটা 'আফরিন' লেখা চলবে না! তবে, বিরোধীরা ছাড়বে কেন? 'গাছেরও খাব, আর তলার কুড়াব'! অতি চালাকের গলায় দড়ি! কলকাতা হাইকোর্টে কেস চলছে। হিন্দু বাঙ্গালিরা কী আশা করেন? দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলির কথা ভাবুন! ঠিক পাঁচ বছর বেতন নেওয়ার পর রায় বেরুবে, 'ওটা বেআইনি পদ্ধতি ছিল'!

এরও সমাধান আছে। হতাশ হবেন না। (১) সব সময় মনে রাখুন ভারত কেন ধর্ম-নিরপেক্ষ আর পাকিস্তান আর বাংলাদেশ কেন ইসলামিক রাষ্ট্র হলো? (২) যদি সৎ মানুষ হন, মোদীর নামে ভোট দিন! প্রার্থীকে দেখবেন না। (৩) 'নোটা'র বোতাম কখনই টিপবেন না। (৪) সাহস করে ভোট দিন যদি না কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো উদ্বাস্তু হতে চান! (৫) মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদি অভিশাপের হাত থেকে মুক্ত করার পবিত্র দায়িত্ব আপনার হাতেই আছে। (৬) মোদী একশো কোটি হিন্দুর একমাত্র হিতৈষী যাঁর স্লোগান হলো 'সবকে সাথ, সবকে বিকাশ'। আর অন্যদিকে হিন্দু নামধারী অথচ কট্টর হিন্দু-বিরোধী ২৫টি পার্টির সব নেতা সম্মিলিত ভাবে দেশের অখণ্ডতা এমনকী আপনার আমার নিরাপত্তাকেও বিসর্জন দিতে রাজি আছেন। (৭) বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন সবাইকে ভোট দিতে অনুপ্রাণিত করুন এবং দয়া করে যোগ্যব্যক্তিকে ভোটটি দিয়ে দেশের মঙ্গল করুন। ■

বাঙ্গালি কি এখনো ইতিহাস তৈরি করতে সক্ষম ?



সুজয় চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ১৭তম লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি নেমে পড়েছে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করতে এবং অর্ধেকের বেশি ঘোষণাও প্রায় শেষ। শুরু হয়ে গেছে জোট বাঁধা বা অন্যের সঙ্গে নিজের শক্তি মেলানোর রাজনীতি। মূল লড়াই হবে প্রধানত দুটি পুরোনো জাতীয় দলের মধ্যে— বিজেপি ও কংগ্রেস। দুটি দলই অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকে নিজেদের পাশে পেতে ইচ্ছুক। প্রথম দলটি বহন করে চলেছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের হিন্দু জাতীয়তাবাদ তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গৌরব। দ্বিতীয় দলটিরও কোনো এককালে এই 'জাতীয়তাবাদী' তকমা ছিল, কিন্তু কালের প্রভাব ও জনসঙ্ঘের উত্থানের ফলে যে হাওয়া জনসঙ্ঘের দিকে চলে যায়, ফলে অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এখন দিশাহীন। কংগ্রেস শুধু দিশাহীন নয়, আদর্শহীনও বটে, আর লক্ষ্যহীনও বটে। অবশ্য চিরকাল এরকম ছিল না। স্বদেশি যুগে 'লাল-বাল-পালেরও' তো একটা আদর্শ ছিল। মাহাত্মা গান্ধীরও ছিল। নেহরু-ইন্দিরার সময়েও ছিল দেশের জন্য কিছু একটা করার তাগিদ। অবস্থার পরিবর্তন করলেন দুটি ব্যক্তি— প্রথমজন বঙ্গের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিতীয়জন বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ। এই দুইজনের ওপর কংগ্রেসের খুব রাগ। কারণ এই দুইজন না থাকলে হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতো। এই দুই ব্যক্তি যা করেছিলেন তা হয়তো বর্তমান সময়ে শিবসেনা, অকালি দল, অসম গণপরিষদ, এ আই এ ডি এম কে, তেলুগু দেশম, সমাজবাদী পার্টি একসঙ্গে জোট বাঁধলেও পারবে না। প্রথমজন শ্যামাপ্রসাদ— ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জনসঙ্ঘ-হিন্দু মহাসভা-রামরাজ্য পরিষদ সকলকে একসঙ্গে নিয়ে সূচনা করেছিলেন লোকসভায় 'হিন্দু জোট', দ্বিতীয়জন জনসঙ্ঘ থেকে সোশ্যালিস্ট সবাইকে নিয়ে 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'। জয়প্রকাশ নারায়ণের ধাক্কা ছিল এতটাই প্রবল যে পতন হয় ইন্দিরা গান্ধীর তথা কংগ্রেসের এবং ক্ষমতায় আসে প্রথম ইন্দিরার এমার্জেন্সি বিরোধী জনতা পার্টি। সেই যে কংগ্রেসের 'খারাপ ভাগ্যের' সূচনা হলো জনতা সরকারের হাত ধরে তা আজও চলছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ যদি ধাক্কা দেন ইন্দিরা গান্ধীকে, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ ধাক্কা দিয়েছিলেন নেহরুকে। জয়প্রকাশ ছাড়া যেমন 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' সম্ভব ছিল না, তেমনি নেহরু-বিরোধী রাজনৈতিক দল শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া অসম্ভব ছিল। এই যে দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি বাস করছে, তাও এক প্রকার অসম্ভব ছিল। বর্তমানে ডব্লুউ সি ব্যানার্জি ও সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যেমন জাতীয় কংগ্রেসের উত্থানের ইতিহাস লেখা অসম্ভব, তেমনি শ্যামাপ্রসাদকে বাদ দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

এই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেছিলেন কংগ্রেস থেকে। পরবর্তীকালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে এলেন হিন্দু মহাসভায়। দেশভাগ ও গান্ধী হত্যা হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করায়। তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক

"জয়প্রকাশ নারায়ণ যদি ধাক্কা দেন ইন্দিরা গান্ধীকে, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ ধাক্কা দিয়েছিলেন নেহরুকে। জয়প্রকাশ ছাড়া যেমন 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' সম্ভব ছিল না, তেমনি নেহরু-বিরোধী রাজনৈতিক দল শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া অসম্ভব ছিল। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালিরা যে বাস করছে, তাও এক প্রকার অসম্ভব ছিল।"

মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরের ইচ্ছায় এবং পরামর্শে তিনি শুরু করলেন নতুন দল 'জনসঙ্ঘ'। ১৯৫১ সালে জনসঙ্ঘের শুভারম্ভ হয় এবং ১৯৫২-তে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জনসঙ্ঘ ৩টি আসন পায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জনসঙ্ঘের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজস্থান থেকে উমাশঙ্কর ত্রিবেদী। হিন্দু মহাসভা এই নির্বাচনে ৪টি আসন পায়, তার মধ্যে অন্যতম হুগলির সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বামী করপত্রী পরিচালিত রামরাজ্য পরিষদ জেতে ৩টি আসন এবং পরবর্তীকালে এটি জনসঙ্ঘে মিলে যায়। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ গঠন করলেন— 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' (এনডিপি), যাতে ৩২ জন লোকসভার সদস্য ও ১০ জন রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। এরপর শ্যামাপ্রসাদ তৈরি করলেন একটি ইতিহাস যা আজও কোনও বাঙ্গালি পার্লামেন্টে বসে করতে পারেননি। ২৬ জুন, ১৯৫২ সালে কাশ্মীর প্রশ্ন, ৩৭০ ধারা এবং শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর প্রবেশের 'অনুমতির' বিরোধিতা করে তাঁর সেই বিখ্যাত ভাষণ যাতে তিনি বলেন— 'একটি দেশে দুটি বিধান, দুটি প্রধান আর দুটি নিশান চলবে না।' ভারতীয় জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা এবং জম্মু প্রজা পরিষদ একত্রে ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করে। ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লা ও নেহরুর নীতির বিরুদ্ধে অনশনে বসেন শ্যামাপ্রসাদ। সেই সময় কাশ্মীরের আলাদা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়, যার অনুমতি ছাড়া কোনো ভারতীয় কাশ্মীর ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবেন না। কোনো ভারতীয় প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর 'পরিচিতি পত্র' বা আইডি কার্ড দেখানো বাধ্যতামূলক ছিল। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখতেন, তাই কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। সরকারি অনুমতির তোয়াক্কা না করে তিনি প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। লাখেনপুরে তাঁকে গ্রেফতারের পর শ্রীনগরে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তাকে শহরের বাইরে রাখা হয়। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন রাজ্য সরকার তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে। কারণ হিসাবে দেখানো হয় হৃদযন্ত্রের বিকলতা বা হার্ট-অ্যাটাক। তাঁর মৃত্যু সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধানের মতো ইতিহাসে বহু প্রশ্নের জন্ম দেয়। এটির পেছনে নেহরু ও শেখ আবদুল্লার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্ন-উত্তরের পালা আজও চলছে এবং চলবে।

২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী এটিকে নেহরুর ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন। যাইহোক, তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর মানসপুত্র 'জনসঙ্ঘের' মৃত্যু হয়নি। নেহরু, ইন্দিরা বা তৎকালীন বাম নেতৃত্ব জনসঙ্ঘের অগ্রগতিকে রোধ করতে ব্যর্থ হন। ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জনসঙ্ঘের ৩টি আসন থেকে ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় লোকসভায় ৪টি, তৃতীয় লোকসভায় (১৯৬২) ১৪টি, চতুর্থ লোকসভায় (১৯৬৭) ৩৫টি জনসঙ্ঘের আসন সংখ্যা বাড়তেই থাকে। ১৯৭৭-এ জনতা পার্টির অংশ হিসাবে তারা পার্লামেন্টে ৯৪টি আসন লাভ করে। শ্যামাপ্রসাদের পরেও জনসঙ্ঘের সভাপতি হিসাবে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব উঠে আসেন, তার মধ্যে বাংলার দেবপ্রসাদ ঘোষ (১৮৯৪-১৯৮৫)-এর নাম করা যায়, যিনি ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত জনসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘকালীন থাকা বিরোধী নেতা হিসাবে বিখ্যাত এবং নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও মনমোহন সিংহের পর চতুর্থ নেতা যিনি সবচেয়ে বেশি সময় কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। একাধারে ভাষাবিদ, আইনজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, সাংবাদিক আচার্য ঘোষ তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন মাত্র ২১ বছর বয়সে, কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে। পরবর্তীকালে বাজপেয়ী-আদবানি পরিচালিত বিজেপিতে আমরা অনেক বিখ্যাত নেতা দেখেছি। রাজ্য বিজেপিতেও এক সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন হরিপদ ভারতী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তিত্বরা, কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কোনো শ্যামাপ্রসাদ বা নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উত্থান হয়নি। জনসঙ্ঘ পরবর্তী যুগে বিজেপি বাঙ্গালির কাছে গো-বলয়ের পার্টি হয়েই থেকে গেছে। এই বঙ্গ-বিজেপি থেকে পার্লামেন্টে গেছেন তপন সিকদার ও সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে বাবুল সুপ্রিয় এবং আলুওয়ালিয়া। রাজসভায় গেছেন রূপা গাঙ্গুলি। কিন্তু রূপা-বাবুল সুপ্রিয়রা কি পারবেন সেই শ্যামাপ্রসাদ-এন সি-র মতো সাহস দেখাতে? তারা কি পারবেন সর্বভারতীয় স্তরে বাঙ্গালির হারিয়ে যাওয়া অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে? পুরো ভারত তথা বিশ্ব আজ পশ্চিমবঙ্গের দিকে চেয়ে আছে। নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গান্ধী হত্যার পরেও শত বিপদেও হিন্দু মহাসভা ছাড়েননি, শ্যামাপ্রসাদ ছাড়েননি তাঁর 'কাশ্মীর ইস্যু', আজ হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ, রাম রাজ্য পরিষদ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আজও হয়নি, দেশভাগের ক্ষত আজও মোছেনি, কিন্তু এখনো জেগে আছে বহু বছর আগে দেখা একটি স্বপ্ন— 'ভারতে একদিন হিন্দু ঐক্য আসবে। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।'

ভারতের এই হিন্দু নবজাগরণের স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাঁরা আজ নাই বা থাকুন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে কোটি কোটি ভারতবাসী। এই সময় যদি হিন্দু বাঙ্গালি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে ইতিহাস বাঙ্গালিকে ক্ষমা করবে না! ইতিহাসের পাতায় হিন্দু বাঙ্গালি পরিচিত হবে একটি ব্যর্থ, স্বপ্নহীন, হেরে যাওয়া জাতি হিসাবে। সে যুগে শ্যামাপ্রসাদ-দুর্গাচরণ-নির্মলচন্দ্ররা না থাকলে আজকে কি আমরা দেখতে পেতাম এই বিজেপিকে? মারাঠা পেশোয়ারা যদি 'হিন্দু পাদ পাদশাহির' স্বপ্ন দেখে থাকেন, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ-দুর্গাচরণরা দেখেছিলেন 'Parliamentary Politics' বা সংসদীয় রাজনীতির হিন্দুত্বকরণের স্বপ্ন। হিন্দু বাঙ্গালি কি এবারে ঘটাতে পারে 'ভোট বিপ্লব'? জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে জুন মাস অবধি। সবাই শ্যামাপ্রসাদ- দুর্গাচরণ- নির্মলচন্দ্রের নাম স্মরণ করুন আর প্রস্তুত হোন 'ভোটযুদ্ধের' জন্য। ■

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের নির্বাচন কমিশনকে ভিভিপ্যাট স্লিপের নমুনা গণনার প্রতিবেদন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইন্ডিয়া স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) গত ২২ মার্চ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এবং সুশীল চন্দ্রের কাছে ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল (ভিভিপ্যাট) স্লিপের নমুনা গণনার একটি প্রতিবেদন তুলে দেয়। আইএসআই দিল্লি শাখার প্রধান অধ্যাপক অভয় জি ভাট এই প্রতিবেদনটি জমা দেন। দেশ জুড়ে ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনার পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জোরালো হচ্ছিল। সেই আবহে নির্বাচন কমিশন আই এস আই-কে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে গণনা এবং ভিভিপ্যাট স্লিপের গণনার বিষয়টি নিয়ম মেনে পর্যালোচনা এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব দেয়।

দেশের মধ্যে আই এস আই একটি অত্যন্ত খ্যাতনামা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিসংখ্যানগত নানা প্রয়োগ, তার গবেষণা, শিক্ষা এবং নমুনা যাচাইয়ের কাজ করে। এই প্রেক্ষিতে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত। ভিভিপ্যাট স্লিপ নির্বাচনের সময় গণনার পরিমাণ বিবেচনার জন্য আই এস আই-এর গাণিতিক মেধা, পরিসংখ্যানগত উৎকর্ষ এবং বাস্তব প্রয়োগের সাহায্য নেওয়া হয়।

আই এস আই-এর দিল্লি শাখার প্রধান অধ্যাপক অভয় জি ভাট ছাড়াও এই বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিসের (এন এস এসও) ডিরেক্টর জেনারেল, চেন্নাই ম্যাথমেটিক্যাল ইনস্টিটিউটের নির্দেশক অধ্যাপক রাজীব এল করন্ডিকর, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিস, এমওএসপিআই-এর সামাজিক পরিসংখ্যান বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ওঙ্কার প্রসাদ ঘোষকে মনোনীত করেন। পুরো রিপোর্টটি তৈরির আগে এই বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিসংখ্যানের অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরামর্শও পর্যালোচনা করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি 'র‍্যান্ডাম স্যাম্পেলিং ফর টেস্টিং অব ইভিএম্স ভায়া ভিভিপ্যাট স্লিপ ভেরিফিকেশন' শীর্ষক প্রতিবেদনটি কমিশনের কাছে আজ পেশ করেছে। কমিশন, বিশেষজ্ঞ কমিটির এই রিপোর্টটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

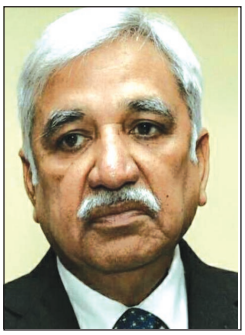
নির্বাচন কমিশনের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে 'আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য স্বেচ্ছায় নীতি-নির্দেশিকা' প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নির্বাচন কমিশন ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়ার প্রসঙ্গটি আজ যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। মানুষের বিচার না করে, তার অবস্থান না দেখে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলেই তথ্য ব্যবহারে সুযোগ পান। সকলের জন্য এই সুযোগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মতো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার অন্যতম চাবিকাঠি। সোশ্যাল মিডিয়ার সংগঠন 'ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া' (আই এ এম এ আই) গত ২০ মার্চ নতুন দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এবং সুশীল চন্দ্রকে '২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের জন্য স্বেচ্ছায় এক নীতি-নির্দেশিকা' দিয়েছে। আই এ এম এ আই এবং ফেসবুক, ট্যুইটার, গুগ্‌ল, শেয়ার-চ্যাট, টিকটক-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৯ মার্চ, মঙ্গলবার এক বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে নৈতিকতার এই নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়।

শ্রীঅরোরা বলেন, এ ধরনের নীতি-নির্দেশিকা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলির এই নীতি-নির্দেশিকা পালনের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সংস্থাগুলি নানা ধরনের মানুষকে পরিষেবা দিয়ে থাকে। এই নীতি-নির্দেশিকাটি দেশের আইনি পরিকাঠামোর মধ্যেই প্রয়োগ করা হবে। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬নং ধারায় সিনহা কমিটির প্রস্তাব অনুসারে, কোনো নিয়ম মানা না হলে এই প্লাটফর্ম তিন ঘণ্টার মধ্যে তা নির্বাচন কমিশনকে জানাবে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে সম্মত হয়েছে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া মত প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রেখে নির্বাচনী প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে। সাধারণ নির্বাচনের সময় নিয়মভঙ্গের কোনো ঘটনা ঘটলে ওই প্ল্যাটফর্ম দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটারিং কমিটির নির্দেশিকা মেনে ওই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের অংশীদাররা একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন যার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন তৈরির সময় রাজনৈতিক পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হবে। রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নীতি-নির্দেশিকা স্বচ্ছতা বজায় রাখবে। প্ল্যাটফর্মের সদস্যরা ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় প্রচার চালানোরও দায়িত্ব নিয়েছেন।

মুদ্রণ মাধ্যমে নির্বাচনী সংবাদ পরিবেশনে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নির্বাচন কমিশন সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, ওড়িশা ও সিকিমের বিধানসভা নির্বাচন বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-র ১২৬ ধারার সংবাদ পরিবেশন সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে জানানো হয়েছে যে, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া নির্বাচন চলাকালীন মুদ্রণ মাধ্যমের জন্য বেশ কয়েকটি নীতি-নির্দেশিকা জারি করেছিল। প্রেস কাউন্সিলের সেই নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে :



মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা।

(১) মুদ্রণ মাধ্যমের দায়িত্ব হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রার্থীদের বিষয়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা। সংবাদপত্রগুলি নির্বাচনের সময় যে প্রচারাভিযান চালাবে তা যাতে আপত্তিকর না হয় বা কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কিংবা ঘটনা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশিত না হয়, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বাস্তবে, দুই বা তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সব সংবাদমাধ্যম বেশি গুরুত্ব দেয় বলেই দেখা গেছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় কোনো প্রার্থী যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বা বিরোধী প্রার্থী সম্বন্ধে কোনো আপত্তিকর মন্তব্য করেন, তাহলে সংবাদপত্রকে সেটি প্রকাশ করতে হবে।

(২) নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী, সম্প্রদায় বা জাতপাতের ভিত্তিতে কোনো নির্বাচনী প্রচার চালানো যায় না। সেজন্য, সংবাদপত্রের উচিত ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় বা ভাষার ভিত্তিতে যাতে কোনোরকম বিভেদ তৈরি হয়, এরকম সব সংবাদ এড়িয়ে চলা।

(৩) কোনো প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণ কিংবা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্বন্ধে মিথ্যা বা সমালোচনামূলক কোনো তথ্য প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রগুলিকে বিরত থাকতে হবে। কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে অভিযোগের তথ্য যাচাই না করে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যাবে না।

(৪) কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের হয়ে কোনো বিশেষ প্রচার চালানোর জন্য সংবাদপত্র কোনোরকম আর্থিক বা অন্য কোনো ধরনের প্রলোভনের শিকার হবে না।

(৫) সংবাদপত্র কোনো বিশেষ প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের জন্য প্রচার চালাবে, এমনটা কখনই প্রত্যাশিত নয়। যদি এরকম হয়ে থাকে, তাহলে অন্য প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলকে অভিযোগ সম্বন্ধে জবাব দেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

(৬) সংবাদপত্রগুলি, সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ বা প্রকাশ করবে না।

(৭) নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসার বা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সময়ে সময়ে যে সকল নির্দেশাবলী বা আদেশ জারি করে সেগুলি সংবাদপত্রকে মেনে চলতে হবে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে ভিন্নভাবে সক্ষমদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্প, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, যথাযথ আলো এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা, শৌচালয় এবং ছাউনি। এ পর্যন্ত 'সি-ভিজিল' অ্যাপের মাধ্যমে ১,৪২৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৮৮২টি অভিযোগ সত্য এবং এই অভিযোগগুলির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারে পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জীবনধারণের অনুকূল এই পরিবেশের স্বার্থে প্লাস্টিক ও পলিথিনের মতো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকারক সামগ্রীর বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে সমস্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং তাদের স্বীকৃত সংস্থাগুলিকে প্লাস্টিক ও পলিথিনের মতো সামগ্রী বা উপকরণের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রিটার্নিং আধিকারিকদের কাছে পাঠানো নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দল ও দলীয় প্রার্থীদের সভার সময় পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ-বান্ধব নয় এমন উপকরণ না ব্যবহার করার ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

আরও বলা হয়েছে, কমিশনের এই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

রম্যরচনা

পাড়ার বুথে ভোট দিতে গেছেন পল্টুদা। ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় একজন পোলিং এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন—একটু দেখুন তো ভাই আমার স্ত্রী ভোটটা দিয়ে গেছেন কিনা?

পোলিং এজেন্ট অনেকক্ষণ ধরে ভোটার তালিকা নেড়েচেড়ে বলল— হাঁ কাকু। কাকিমা ভোট দিয়ে গেছেন।

পল্টুদা— যাঃ, এবারও দেখা হলো না।

পোলিং এজেন্ট (অবাক হয়ে)— দেখা হলো না মানে? আপনারা কি এক বাড়িতে থাকেন না?

পল্টুদা— আরে নারে বাবা। আমার বউ দশ বছর আগেই মারা গেছে। কিন্তু প্রতিবারই ভোট দিতে এসে শুনি, আমার বউ একটু আগেই ভোট দিয়ে গেছে। তাই ভেবেছিলাম, এবার যদি একটু দেখা হয়ে যেত...



উবাচ



কল্যাণ সিংহ
রাজস্থানের রাজ্যপাল

“প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলের।”

জয়পুরে এক অনুষ্ঠানের বক্তব্যে



সুষমা স্বরাজ
বিদেশমন্ত্রী

“আমি শুধু সিন্ধুপ্রদেশে দুজন হিন্দু নাবালিকাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরকরণ ও বিবাহের রিপোর্ট চেয়েছিলাম ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে। এতেই অপনারা বিব্রত! আসলে এটি আপনাদের অপরাধবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।”

পাকমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
অভিনেতা

“এস এস সি চাকরি প্রার্থীদের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করছে না। এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এটা নির্দয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।”

এস এস সি চাকরি প্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য



বিজয় রূপানি
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

“যদি কোনওভাবে কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়ী হয় তাহলে পাকিস্তানে দিওয়ালি পালন করা হবে।”

পুলওয়ামা কাণ্ডে কংগ্রেস নেতাদের পাকিস্তানের সঙ্গে এক সুরে কথা বলা প্রসঙ্গে

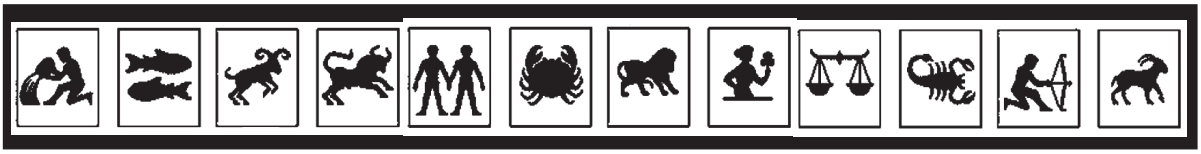


অনুপম হাজরা
যাদপপুরে বিজেপি প্রার্থী

“অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যদি হয়, মানুষ যদি ভোট দিতে পারেন তাহলে জয়ের ব্যাপারে আমার কোনও সংশয় নেই।”

লোকসভা নির্বাচনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



১ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ৭ এপ্রিল (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে মঙ্গল, মিথুনে রাহু, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু, কুম্ভে বুধ, শুক্র। মীনে রবি। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র থেকে মেষে অশ্বিনি নক্ষত্রে।

মেষ ঃ উদার, নীতিনিষ্ঠ, মানব বেদনায় সহানুভূতি, পাণ্ডিত্য প্রভাবে ও বাগ্মিতায় খ্যাতি ও বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য অর্থাৎ ভালো কাজে ভালো লোকের সংসর্গ ও প্রভাব বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অভীষ্ট সিদ্ধি করায়ত্ত। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য। প্রতিবেশী ও রমণীর প্ররোচনায় বিপথে চালিত করতে পারে।

বৃষ ঃ অসৎ সংসর্গ ও আইনি জটিলতা ও প্রেমজ বিষয়ে ভারাক্রান্ত মন। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, হঠাৎ প্রাপ্তি, তবে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। গৃহসজ্জা ও বিলাসব্যসনে ব্যয়াধিক্য যোগ। প্রিয়জনের সঙ্গে সখ্যতা বাক্যালাপে সংযম প্রয়োজন। খেলাধুলার সঙ্গে যুক্তদের স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ।

মিথুন ঃ গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়েরই শারীরিক ক্লেশ ও সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা ও স্বজন বিরোধিতায় সতর্ক থাকুন। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পরিবারে সদস্য বৃদ্ধির যোগ। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতায়পূর্ণ মুল্যায়নের আশা কম। গুরুজনের পরামর্শ আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক।

কর্কট ঃ বিদ্যা, কর্মে সাফল্য, কাব্য কথায় নিপুণ, শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক, বুদ্ধিমত্তায় পেশাগত প্রশংসা ও সামাজিক কর্ম ব্যস্ততা যা ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। গৃহ-সংস্কার, রমণীর সান্নিধ্য ও শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। বিদ্যার্থী ও কর্মপ্রার্থীর মেধা ও দক্ষতার মেলবন্ধনে বিজয়ীর সম্মান। প্রবাস ও ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

সিংহ ঃ পুরানো কোনো ঋণের সুরাহা, বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান। সম্পত্তি থেকে আয়, তবে গৃহসুখ কিছুটা বিঘ্নিত হবে। কবি, লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক, অধাপক, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞের প্রতিভার স্ফুরণ ও সৃষ্টিশীলতায় লোকসন্তুষ্টি ও সামাজিক বদান্যতা। দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি। ফাটকা ব্যবসায় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুভ।

কন্যা ঃ নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও গবেষণামূলক কর্মে সাফল্য। ভ্রাতা, ভগ্নী ও বেকারদের শুভ ও আনন্দদায়ক খবর আশা করা যায়। বিতর্কিত মন্তব্য ও স্পষ্ট বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে বিড়ম্বনা ও নেতিবাচক ফল। অনিদ্রা, জ্বর ও রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত অস্বস্তি। পুরাতন সুহৃদ পুর্নমিলনে মানসিক প্রশান্তি।

তুলা ঃ জীবনসঙ্গীর বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক শান্তি, অর্থ-বিত্ত ও সৌভাগ্যের দরজা উন্মুক্ত। কর্মক্ষেত্রে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রগতি। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কের অভাব। প্রিয়জনদের সঙ্গে সখ্য, বাহন যোগ, তীর্থ ভ্রমণ। মিষ্ট স্বভাবের প্রকাশ, বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও সময়ের অপচয়। গর্ভাশয় ও মূত্র সংক্রান্ত জটিলতা।

বৃশ্চিক ঃ আবেগপ্রবণতায় শত্রুতা বৃদ্ধি ও সমালোচনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, ব্যস্ততা, চাপ ও শারীরিক ক্লেশ। পারিবারিক সুস্থিতি বিঘ্ন ও বকেয়া পাওনায় বিলম্ব। প্রতিবেশী ও সহোদরের বিরুদ্ধাচারণ। সন্তানের মেধার বিকাশ ও উচ্চশিক্ষায় ইতিবাচক ফল। কর্মপ্রার্থীর কর্মলাভ।

ধনু ঃ আয়ের শ্লথ গতি তবে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুভ। চলাফেরায় সতর্ক। সন্তান-সন্ততি, বিদ্যার্থী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্য পিপাসুদের প্রতিভার স্ফুরণ। মর্যাদা, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। গুরুজনে শ্রদ্ধা ও দেব-দ্বিজে ভক্তি অটুট থাকবে। যুবক মিত্র হিতকারী নয়। বিবাদে বুদ্ধিবল প্রয়োগে সমাধান ও শংসা।

মকর ঃ কর্মক্ষেত্রে চাপ ও ব্যস্ততায় শারীরিক ও মানসিক অবসাদ। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কোনো খবর আশান্বিত করবে। ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে বিরত থাকা ও বিদ্যার্থীদের পড়াশোনায় মনঃসংযোগ দরকার। নিজ পছন্দের জাতক-জাতিকার বিবাহ সম্পন্ন। সমাজকল্যাণে সক্রিয়তায় জনপ্রিয়তা ও সুধীজনের সান্নিধ্য লাভ।

কুম্ভ ঃ আপোশসীন মনোভাবে স্বজন সম্পর্কে উন্নতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বিদেশি ও ধর্মীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যে জমি-বাড়ি বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা ও ভ্রমণে বাধা থাকবে। সন্তান ও ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সন্তানলাভ, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রতিভার স্বাক্ষর। পুরাতন মিত্রের সঙ্গলাভ ও মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি।

মীন ঃ মন-মেজাজ শান্ত ও সংযত রাখুন, অন্যথায় পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভার্থে কারও সহায়তা লাভ। বহুমুখী প্রতিভায় ব্যবসায়ী ও পেশাদারদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আত্মীয় ও বন্ধুপ্রীতি বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীর অধ্যয়নে রুচি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কঠিন।

● জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য